ছোটদের বেতালের গল্প

খগেন্দ্রনাথ মিত্র



ছোটদের বেতালের গল্প

খগেন্দ্রনাথ মিত্র

দে'জ পাবলিশিং ॥ কলিকাতা ৭০০০৭৩

প্রথম প্রকাশ :
কলিকাতা পুস্তকমেলা
ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৪
দ্বিতীয় সংস্করণ :
চৈত্র, ১৩৯৩
মার্চ, ১৯৮৭

প্রকাশক :
সুভাষচন্দ্র দে
দে'জ পাবলিশিং
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট
কলিকাতা ৭০০০৭৩

সৌজন্য :
শিল্পী শ্রীপূর্ণ চক্রবর্তী
আশুতোষ লাইব্রেরী

মুদ্রণ :
সনাতন হাজরা
প্রভাবতী প্রেস
৬৭ শিশির ভাদুড়ী সরণী
কলিকাতা ৭০০০০৬

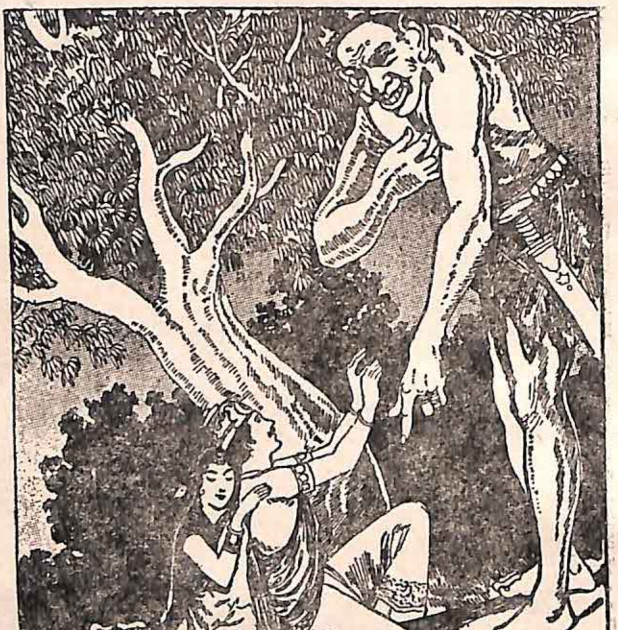
দাম : ১২ টাকা

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাজকুমার চক্রবর্তী

করকমলেষু—

লেখকের অন্যান্য বই

গড়-জঙ্গলের কাহিনী
পাতালপুরীর কাহিনী
কিশোর সম্ভার



রাক্ষস আসিয়া বলিল, তোমার···

সূচনা

অনেককাল আগে উজ্জয়িনী নগরে গন্ধর্বসেন নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার ছয় পুত্র ; পুত্রগণ সকলেই খুব গুণবান ও সকল বিষয়ে সুপণ্ডিত ছিলেন। আবার, তাঁহাদের মধ্যে বিক্রমে, বিদ্যায় ও জ্ঞানে শ্রেষ্ঠ ছিলেন মধ্যম পুত্র। তাঁহার নাম ছিল, বিক্রমাদিত্য।

গন্ধর্বসেনের মৃত্যুর পর জ্যেষ্ঠ পুত্র শঙ্কুই রাজা হইলেন ; কিন্তু মধ্যম ভ্রাতা বিক্রমাদিত্যের উপর তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন না। তাঁহার ভয় ছিল, বিক্রমাদিত্য বুঝি তাঁহাকে হত্যা করিয়া স্বয়ং রাজা হইবেন। এইজন্য তিনি বিক্রমাদিত্যকে হত্যা করিবার উদ্দেশ্যে নানা চক্রান্ত করিতে লাগিলেন ; কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁহার চেষ্টা সফল হইল না— বিক্রমাদিত্যই তাঁহাকে হত্যা করিয়া উজ্জয়িনীর রাজা হইলেন। তারপর ক্রমে বহু দেশ জয় করিয়া, তিনি সারা জম্বুদ্বীপের অধিপতি হইয়া উঠিলেন।

কিছুকাল যায়। রাজা বিক্রমাদিত্য মহাসুখে রাজত্ব করিতেছেন। একদিন তিনি মনে মনে ভাবিলেন, 'আমি ত সমস্ত জম্বুদ্বীপের অধিপতি। কিন্তু আমার রাজ্যে প্রজারা কি ভাবে দিন কাটায়, নিজের চোখে দেখিতে হইবে।' এইরূপ স্থির করিয়া তিনি তাঁহার ছোট ভাই ভর্তৃহরির হাতে রাজ্যের ভার দিয়া, সন্ন্যাসীর বেশে রাজ্যভ্রমণে বাহির হইলেন।

কিন্তু ভর্তৃহরির ভাগ্যে বেশীদিন রাজত্ব করা ঘটিল না। স্ত্রীর দুর্ব্যবহারে সংসারের উপর তাঁহার বৈরাগ্য জন্মিল। তিনি সন্ন্যাসী হইয়া বনে চলিয়া গেলেন। রাজা বিক্রমাদিত্যের সিংহাসন শূন্য পড়িয়া রহিল।

এই সংবাদ দেবরাজ ইন্দ্রের নিকট পৌঁছিল। তিনি উজ্জয়িনীর রক্ষার জন্য তৎক্ষণাৎ এক যক্ষকে নিযুক্ত করিলেন। যক্ষ রাত্রিদিন

উজ্জয়িনী নগর রক্ষা করিতে লাগিল।

ওদিকে রাজা বিক্রমাদিত্য এই ব্যাপারের কিছুই জানিতে পারিলেন না ; তিনি দেশে দেশে বেড়াইতেছেন এবং প্রজাদের অবস্থা দেখিতেছেন। কিন্তু একদিন শুনিতে পাইলেন, ভর্তৃহরি সন্ন্যাসী হইয়া বনে গিয়াছেন ; উজ্জয়িনীর সিংহাসন শূন্য পড়িয়া আছে। সংবাদটি শুনিবামাত্র তিনি রাজধানীতে যাত্রা করিলেন।

বিক্রমাদিত্য চলিয়াছেন ; যখন উজ্জয়িনীর নিকট পোঁছিলেন, তখন রাত্রি গভীর। তোরণ দিয়া নগরে প্রবেশ করিতে যাইবেন, এমন সময় যক্ষ তাঁহার পথরোধ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"তুই কে ? কোথায় যাইতেছিস্ ? তোর নাম কি ?"

বিক্রমাদিত্য বলিলেন—"আমি রাজা বিক্রমাদিত্য ; নিজের রাজধানীতে যাইতেছি। তুই কে ? কি জন্য আমার পথরোধ করিতেছিস ?"

যক্ষ বলিল—"দেবরাজ ইন্দ্রের আদেশে আমি এই নগর রক্ষা করিতেছি। তাঁহার অনুমতি না পাইলে, আমি তোকে এই নগরে যাইতে দিব না। তবে তুই যদি সত্যই রাজা বিক্রমাদিত্য হ'স্, তাহা হইলে আমার সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহার প্রমাণ দে। তাহার পর নগরে যাইতে দিব।"

বিক্রমাদিত্য যক্ষের কথা শুনিয়া তরবারী লইয়া তৎক্ষণাৎ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইলেন। উভয়ের ঘোর যুদ্ধ হইল। শেষে রাজা বিক্রমাদিত্য যক্ষকে পরাস্ত করিয়া তাহাকে মাটিতে ফেলিয়া দিলেন ও তাহার বুকের উপর উঠিয়া বসিলেন।

তখন যক্ষ বলিল—"তুমি আমায় পরাস্ত করিয়াছ। তোমার বিক্রম দেখিয়া বুঝিলাম, তুমিই রাজা বিক্রমাদিত্য। এখন তুমি যদি আমাকে ছাড়িয়া দাও, তাহা হইলে আমি তোমার প্রাণ দান করিব।"

যক্ষের কথা শুনিয়া বিক্রমাদিত্য হাসিলেন ; বলিলেন—"তুই নিতান্ত পাগল। তা' না হইলে এমন অদ্ভুত কথা কেন বলিবি ? আমাকে তুই কি প্রাণ দান করিবি ? মনে করিলে, আমিই এখন

তোকে মারিয়া ফেলিতে পারি।"

যক্ষ হাসিয়া বলিল—"মহারাজ যাহা বলিতেছি, তাহা সত্য। আমি যাহা বলিব, সেইমত কাজ করিলে, তুমি বহুকাল বাঁচিবে ও নিরাপদে অনেক বৎসর রাজত্ব করিতে পারিবে।"

যক্ষের কথায় বিক্রমাদিত্যের বড় আশ্চর্যবোধ হইল। তিনি যক্ষকে ছাড়িয়া দিলেন ; সে উঠিয়া বসিল। রাজা তাহার কথা শুনিবার জন্য প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। যক্ষ কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া বলিতে আরম্ভ করিল—

"মহারাজ, শুন। ভোগবতী নগরে চন্দ্রভানু নামে এক শক্তিশালী রাজা ছিলেন। একদিন তিনি বনে মৃগয়ায় গিয়া দেখিলেন, এক তপস্বী গাছের ডালে পা ও নীচের দিকে মাথা রাখিয়া ঝুলিতে ঝুলিতে ধূমপান করিতেছেন। ইহাতে রাজা বড় বিস্মিত হইলেন। তিনি সেখানকার লোকের কাছে অনুসন্ধান করিয়া এইটুকু মাত্র জানিলেন, তপস্বী অনেকদিন ধরিয়া ঐভাবে তপস্যা করিয়া আসিতেছেন। তিনি কাহারও সহিত কথা বলেন না।

ইহাতে রাজার বিস্ময়ের সীমা রহিল না। তিনি তপস্বীর কথা ভাবিতে ভাবিতে রাজধানীতে ফিরিয়া আসিলেন এবং পরদিন রাজসভায় সকলকে ঐ বৃত্তান্ত বলিলেন। ঐ কথা শুনিয়া সভাসদ্‌গণও বড় বিস্মিত হইল। তারপর রাজা বলিলেন—'যে এই অদ্ভুত তপস্বীকে আমার সভায় আনিতে পারিবে, তাহাকে লক্ষ মুদ্রা পুরস্কার দিব।'

রাজার এই কথা সারা রাজধানীতে রাষ্ট্র হইয়া গেল! ঐ নগরে এক পরমা সুন্দরী কন্যা বাস করিত। ইহা শুনিয়া সে রাজসভায় গিয়া বলিল—'মহারাজ! আপনার আজ্ঞা পাইলে, আমি ঐ তপস্বীকে রাজসভায় আনিতে পারি।'

রাজা কন্যাটিকে তখনই আজ্ঞা দিলেন! সেও তপস্বীকে রাজসভায় আনিতে বনে চলিয়া গেল।

কন্যা বনে গিয়া দেখিল, রাজা চন্দ্রভানু যেমন বলিয়াছেন, ঠিক তেমন ভাবেই এক তপস্বী গাছের ডালে পা লাগাইয়া মাথা নীচের

দিকে দিয়া ধূমপান করিতেছেন। তপস্বীর শরীর অস্থিচর্মসার। তিনি কাহারও সহিত কথা বলেন না। এ অবস্থায় তাঁহার তপ ভঙ্গ করা কঠিন।

কন্যা তখন অনেক ভাবিয়া একটি উপায় বাহির করিল। সে ঐ বনেই তপস্বীর নিকট হইতে কিছুদূরে অতি সুন্দর একখানি গৃহ ও তাহার চারিধারে একখানি চমৎকার বাগান তৈয়ারী করিল। তারপর প্রত্যহ সুস্বাদু মোহনভোগ প্রস্তুত করিয়া তপস্বীর মুখে দিতে লাগিল। একে তপস্বী বহুকাল অনাহারে ছিলেন, তাহার উপর সুস্বাদু মোহনভোগ—একটু একটু করিয়া তিনি তাহার সমস্তই খাইয়া ফেলেন। প্রতিদিন এইভাবে মোহনভোগ খাইয়া তপস্বী মোটা হইলেন ও তাঁহার শরীরে শক্তি ফিরিয়া আসিল। তিনি চোখ মেলিয়া কন্যাকে দেখিতে পাইলেন, এবং গাছ হইতে নামিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'তুমি কে? কি জন্য এই বনে একাকী আসিয়াছ?'

কন্যা বলিল—'আমি দেবকন্যা। তপস্যা করিবার জন্য এই বনে আসিয়াছি। আমি আপনার আশ্রমের নিকটেই বাস করি। আমার বড় সৌভাগ্য যে আপনার সহিত দেখা হইল। আমি ধন্য হইলাম।'

তপস্বী বলিলেন—'আমি তোমাকে দেখিয়া বড় সন্তুষ্ট হইলাম। তোমার ভদ্রতা ও যত্নে বড় তৃপ্তি পাইয়াছি। তোমার আশ্রমটি দেখিতে আমার বড় ইচ্ছা হইতেছে। যদি কোন আপত্তি না থাকে, আর, বেশীদূর না হয়, তাহা হইলে আমাকে সেখানে লইয়া চল।'

কন্যা আনন্দিত মনে তপস্বীকে নিজের গৃহে লইয়া গিয়া তাঁহাকে নানা রকম সুমিষ্ট ফল-মূল, সরবৎ প্রভৃতি খাইতে দিল। তপস্বী সে সকল খাইয়া বড় তৃপ্ত হইলেন। ক্রমে কন্যার আদর ও যত্নে তিনি এমন মুগ্ধ হইলেন যে, আর নিজের আশ্রমে ফিরিয়া গেলেন না বা তপস্যায়ও মন দিলেন না; কন্যাটিকে বিবাহ করিয়া সেইখানেই বাস করিতে লাগিলেন। তারপর যথাসময়ে তাঁহাদের একটি পুত্র হইল।

এইভাবে কিছুদিন যায়। তপস্বী এখন ঘোর সংসারী। কন্যাটি একদিন তপস্বীকে বলিল—'আমরা এতদিন সংসার করিলাম; এইবার

তীর্থে যাইয়া পুণ্যলাভ করা উচিত। চল, আমরা তীর্থে যাই।'

তাহার কথায় তপস্বী সম্মত হইলেন। এই রকম কৌশলে কন্যা পুত্রটিকে তপস্বীর কাঁধে চড়াইয়া রাজা চন্দ্রভানুর রাজধানীতে গিয়া পৌঁছিল। রাজা কন্যাটিকে চিনিতে পারিয়া সভাসদ্‌গণকে বলিলেন —'দেখ দেখ! ঐ সেই কন্যা! কন্যাটি নিজের প্রতিজ্ঞাপালন করিয়াছে। আমি ইহার বুদ্ধি দেখিয়া আশ্চর্য হইয়াছি।'

রাজার কথায় তপস্বীর হঠাৎ চৈতন্যোদয় হইল। তিনি ব্যাপারটি আগাগোড়া বুঝিতে পারিলেন! বুঝিলেন, রাজা চন্দ্রভানু তাঁহার তপস্যা-ভঙ্গের মূল। তিনিই কন্যাটিকে তাঁহার আশ্রমে পাঠাইয়াছিলেন। ইহাতে তপস্বী নিজেকে বারবার ধিক্কার দিতে লাগিলেন এবং রাজার উপর তাঁহার অত্যন্ত রাগ হইল। তিনি রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে তাঁহার কাঁধের ছেলেটিকে মাটিতে ফেলিয়া অন্য বনে চলিয়া গেলেন। সেখানে গিয়া আরও মনোযোগ দিয়া কঠোর তপস্যা করিতে লাগিলেন। তারপর সিদ্ধিলাভ করিয়া রাজা চন্দ্রভানুকে মারিয়া ফেলিলেন।"

গল্প শেষ করিয়া যক্ষ বলিল—"মহারাজ! তুমি, ভোগবতীরাজ, চন্দ্রভানু এবং ঐ তপস্বী এক নগরে, এক নক্ষত্রে ও এক লগ্নে জন্মিয়াছিলে। তুমি রাজার ঘরে জন্মিয়া পৃথিবী পালন করিতেছ; চন্দ্রভানু তেলী হইয়াও ভাগ্যবলে ভোগবতী নগরের রাজা হইয়াছিল; আর ঐ তপস্বী কুম্ভকার-বংশে জন্মিয়াও তপস্যা-বলে রাজা চন্দ্রভানুকে বধ করিয়া তাহাকে শ্মশানের এক শিরীষ গাছের ডালে ঝুলাইয়া রাখিয়াছে। এখন সে তোমাকে হত্যা করিবার চেষ্টায় আছে। তাহা করিতে পারিলেই তাহার ইচ্ছা সফল হয়। তুমি যদি ঐ তপস্বীর হাত হইতে রক্ষা পাও, তাহা হইলে বহুকাল পরম সুখে ও নির্বিঘ্নে রাজত্ব করিতে পারিবে! মহারাজ! তুমি এসকল কথা জানিতে না। আমি তোমাকে জানাইয়া সাবধান করিয়া দিলাম। ইহার দ্বারাই তোমার প্রাণ রক্ষা হইল—" এই বলিয়া যক্ষ স্বস্থানে চলিয়া গেল। রাজাও আশ্চর্য হইয়া যক্ষের কথাগুলি ভাবিতে ভাবিতে রাজবাড়ীতে

প্রবেশ করিলেন।

পরদিন সকালে বিক্রমাদিত্য সিংহাসনে বসিলে সভাসদ্, পরিজন ও প্রজারা তাঁহাকে দেখিয়া বড়ই আনন্দিত হইল। চারিধারে উৎসবের ধুম পড়িয়া গেল।

ইহার পর কিছুদিন চলিয়া গেল। বিক্রমাদিত্য মহাসুখে রাজত্ব করিতেছেন; প্রজারাও মহানন্দে তাঁর রাজ্যে বাস করিতেছে। চারিদিকে বিক্রমাদিত্যের জয়-জয়কার।

একদিন সকালে রাজা পাত্র-মিত্র প্রভৃতি লইয়া সভায় বসিয়া আছেন, এক সন্ন্যাসী আসিয়া তাঁহাকে একটি বেল দিয়া আশীর্বাদ করিলেন। সন্ন্যাসীর নাম শান্তশীল। রাজাও সন্ন্যাসীর নিকট হইতে বেলটি হাত পাতিয়া লইলেন। তারপর দুইজনে কিছুক্ষণ আলাপ হইবার পর সন্ন্যাসী চলিয়া গেলেন। তখন রাজা মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন—'যক্ষ যে তপস্বীর কথা বলিয়াছিল, ইনি বোধ হয় সেই ব্যক্তি। অতএব বেলটি খাওয়া মোটেই উচিত নয়।' ইহা স্থির করিয়া তিনি ভাণ্ডারীকে বেলটি রাখিয়া দিতে আজ্ঞা দিলেন। ভাণ্ডারী রাজার আজ্ঞা পালন করিল।

পরদিন আবার সন্ন্যাসীটি রাজসভায় আসিয়া উপস্থিত। আগের দিনের মত তিনি আজও রাজাকে বেল দিয়া আশীর্বাদ করিলেন। রাজাও বেলটিকে আগেরটির মত ভাণ্ডারীকে রাখিতে দিলেন।

এইভাবে সন্ন্যাসী রাজসভায় আসিয়া রাজাকে বেল দিয়া আশীর্বাদ করিয়া যান। রাজাও ভাণ্ডারীকে বেলটি রাখিয়া দিতে বলেন। একদিন রাজা তাঁহার বন্ধুদের সহিত অশ্বশালা দেখিতে গিয়াছেন। সন্ন্যাসীটি সেখানেও উপস্থিত হইয়া রাজাকে একটি বেল দিয়া আশীর্বাদ করিলেন; কিন্তু রাজা বেলটি হাত পাতিয়া লইবার সময় হঠাৎ তাহা হাত হইতে মাটিতে পড়িয়া ভাঙ্গিয়া গেল এবং তাহার ভিতর হইতে অত্যন্ত উজ্জ্বল এক রত্ন বাহির হইয়া পড়িল। তাহা দেখিয়া রাজা এবং তাঁহার বন্ধুগণ বড় আশ্চর্য হইলেন। এমন উজ্জ্বল রত্ন তাঁহারা আগে কখনও দেখেন নাই। রাজা সন্ন্যাসীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"আপনি আমাকে এমন মূল্যবান রত্ন কি জন্য দিলেন ?"

সন্ন্যাসী বলিলেন—"মহারাজ ! শাস্ত্রে আছে রাজা, গুরু, জ্যোতিষী ও চিকিৎসকের নিকটে খালি হাতে যাইতে নাই। সেই জন্য আমি আপনার নিকট 'রত্নগর্ভ বেল' লইয়া আসি। আর, কেবল যে এই বেলটিতেই রত্ন আছে, তাহা নয়। আমি আপনাকে যতগুলি বেল দিয়াছি, সবগুলিতেই একটি করিয়া এই রকম রত্ন আছে।"

সন্ন্যাসীর কথা শুনিয়া রাজা তৎক্ষণাৎ ভাণ্ডারীকে ডাকিয়া আগের বেলগুলি আনিতে আজ্ঞা দিলেন। ভাণ্ডারী বেলগুলি আনিলে, ভাঙ্গিয়া দেখা গেল, সন্ন্যাসীর কথাই সত্য। প্রত্যেকটি বেলের মধ্যে একটি করিয়া মূল্যবান উজ্জ্বল রত্ন আছে। ইহা দেখিয়া রাজা বড়ই বিস্মিত হইলেন। তাঁহার ইচ্ছা হইল, রত্নগুলির ঠিক দাম কত তাহা জহুরীকে দিয়া যাচাই করিবেন। তিনি সন্ন্যাসীকে লইয়া রাজসভায় গেলেন এবং এক জহুরীকে ডাকাইয়া রত্নগুলি যাচাই করিতে দিলেন।

জহুরী রাজার আজ্ঞায় রত্নগুলি যাচাই করিয়া বলিল—"মহারাজ ! রত্নগুলির প্রত্যেকটির দাম কোটি টাকারও উপর।"

জহুরীর কথা শুনিয়া রাজা অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন এবং সন্ন্যাসীর হাত ধরিয়া সিংহাসনে আপনার পাশে বসাইয়া বলিলেন—"মহাশয় ! আপনি সন্ন্যাসী হইয়া এমন মহামূল্য রত্নগুলি কোথায় পাইলেন ? আর, আমাকেই বা এগুলি দিতেছেন কেন ? আপনার যদি কিছু ইচ্ছা থাকে বলুন, আমি প্রাণপণে তাহা পূরণ করিব।"

সন্ন্যাসী বলিলেন—"মহারাজ ! সভায় এত লোকের মধ্যে সে কথা প্রকাশ করা যাইবে না।"

ইহা শুনিয়া রাজা সন্ন্যাসীকে লইয়া নির্জনে গেলেন।

সন্ন্যাসী বলিলেন—"মহারাজ ! গোদাবরী নদীর তীরের শ্মশানে আমি মন্ত্রসাধন করিব। তাহার ফলে আমার অষ্টসিদ্ধিলাভ হইবে। সেজন্য আমি আপনাকে অনুরোধ করিতেছি যে, একদিন সন্ধ্যা হইতে সকাল পর্যন্ত আপনি সেখানে গিয়া আমার নিকট থাকিবেন। তাহা হইলেই আমার সিদ্ধিলাভ হইবে।"

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন—"কবে যাইতে হইবে বলুন।"

সন্ন্যাসী বলিলেন—"আগামী ভাদ্রকৃষ্ণ-চতুর্দশীতে সন্ধ্যাবেলায় আপনি একাকী আমার নিকট যাইবেন।"

রাজা বলিলেন—"আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন; আমি ঐ দিন সন্ধ্যায় নিশ্চয়ই যাইব।"

রাজাকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিয়া সন্ন্যাসী চলিয়া গেলেন।

তারপর ভাদ্রমাসে কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশী উপস্থিত হইল। প্রতিজ্ঞামত সন্ধ্যাবেলাতেই রাজা বিক্রমাদিত্য একখানি তলোয়ার মাত্র লইয়া একাকী শ্মশানে গেলেন; গিয়া দেখিলেন, সন্ন্যাসী যোগাসনে বসিয়া আছেন। তাঁহাকে ঘিরিয়া অসংখ্য বিকটাকার ভূত, প্রেত, শঙ্খিনী, ডাকিনী মহানন্দে নাচিতেছে। সন্ন্যাসীও দুই হাতে দুইটি মরার মাথা লইয়া বাজাইতেছে। এই ভয়ঙ্কর ব্যাপার দেখিয়া রাজা একটুও ভয় পাইলেন না। তিনি ভক্তিভরে সন্ন্যাসীকে প্রণাম করিয়া বলিলেন—"মহাশয়। আমি আসিয়াছি; আমাকে কি করিতে হইবে আজ্ঞা করুন।"

সন্ন্যাসী বলিলেন—"মহারাজ! যাহারা সৎ তাহারা প্রাণপণে নিজের প্রতিজ্ঞা পালন করিয়া থাকে। আপনি যে আপনার প্রতিজ্ঞা পালন করিয়াছেন, তাহার জন্য আমি খুবই সন্তুষ্ট। আমাকে যদি এক বিষয়ে আপনি সাহায্য করেন ত বড়ই কৃতার্থ হইব।"

রাজা বলিলেন—"আমি আপনার অনুরোধ রক্ষা করিতে সর্বদাই প্রস্তুত।"

সন্ন্যাসী বলিলেন—"এখান হইতে দক্ষিণে—দুই ক্রোশ দূরে এক শ্মশান আছে। সেই শ্মশানের শিরীষ গাছে একটি শব ঝুলান রহিয়াছে। আপনি গিয়া ঐ শবটি আমাকে আনিয়া দিন।"

সন্ন্যাসীর অনুরোধ মত রাজা তৎক্ষণাৎ শবটি আনিতে দক্ষিণের শ্মশানে যাত্রা করিলেন।

রাজা চলিতেছেন। কৃষ্ণচতুর্দশীর ঘোর অন্ধকার রাত্রি—দুই হাত দূরেও কি আছে দেখা যায় না। তাহার উপর আবার আকাশ

ঘেরিয়া মেঘ; ঝর্-ঝর্ ধারায় বৃষ্টি। চারিধারে ভূত-প্রেতগণ মহা-কোলাহল করিতেছে। এমন অবস্থায় কাহার না ভয় হয়? রাজা কিন্তু নির্ভয়ে চলিতেছেন। তিনি শ্মশানের যত কাছে যান, ভূত-প্রেত-গণের দৌরাত্ম্য ততই বাড়ে। শেষে যখন শ্মশানে গিয়া পৌঁছিলেন, তখন এক ভয়ঙ্কর দৃশ্য তাঁহার চোখে পড়িল। দেখিলেন, কোথায়ও বিকটমূর্তি ভূত-প্রেতগণ জীবন্ত মানুষ ধরিয়া খাইতেছে; কোথায়ও ডাকিনীগণ ছেলে-মেয়ে ধরিয়া চিবাইতেছে। রাজা সেদিকে ভ্রূক্ষেপও করিলেন না। তিনি তাহাদের ভিতর দিয়া চারিধারে খুঁজিতে খুঁজিতে শিরীষ গাছের কাছে গিয়া দেখিলেন, গাছটির গোড়া হইতে আগা অবধি ধক্-ধক্ করিয়া জ্বলিতেছে ও ভয়ঙ্কর "মার্-মার্" "কাট্-কাট্" শব্দ হইতেছে। এই সমস্ত দেখিয়া রাজা মনে মনে ভাবিলেন—'যক্ষ যে তপস্বীটির কথা বলিয়াছিল, ঐ সন্ন্যাসী নিশ্চয়ই সেই লোক।'

তারপর তিনি ক্রমে শিরীষ গাছের তলায় গিয়া দেখিলেন, গাছের ডাল হইতে একটি শব দড়িতে ঝুলিতেছে। তাহা দেখিয়া রাজার বড় আনন্দ হইল। তিনি ভাবিলেন, আমার কষ্ট সার্থক। তিনি গাছে উঠিয়া শবের দড়িটি কাটিয়া দিলে শবটি মাটিতে পড়িয়া গেল এবং পড়িয়াই চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। রাজা শবটিকে কাঁদিতে শুনিয়া আশ্চর্য হইলেন। তিনি তাড়াতাড়ি গাছ হইতে নামিয়া শবের কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি কে? কি জন্য তোমার এমন অবস্থা হইয়াছে?"

শব হঠাৎ খিল্-খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল!

এই অদ্ভুত কাণ্ড দেখিয়া রাজা অবাক। ইহার কারণ বুঝিতে না পারিয়া তিনি মনে মনে নানা কল্পনা করিতেছেন। এই অবসরে শব গাছে উঠিয়া আবার আগের মত ঝুলিতে লাগিল। রাজাও তৎক্ষণাৎ গাছে উঠিয়া শবের দড়িটি কাটিয়া ফেলিলেন। কিন্তু এবার আর তাহাকে মাটিতে ফেলিয়া দিলেন না, এক হাতে চাপিয়া ধরিয়া গাছ হইতে নামিয়া আসিলেন। তারপর, অনেক অনুনয় করিয়া তাহার দুরবস্থার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। কিন্তু শব কোন উত্তর করিল না,

ইহাতে রাজা মনে মনে বলিতে লাগিলেন—'যক্ষের মুখে যে তেলীর কথা শুনিয়াছি, এ শব তাহারই। আর ঐ সন্ন্যাসী সেই কুম্ভকার। মন্ত্রসিদ্ধির জন্য সে তেলীর শবকে গাছে ঝুলাইয়া রাখিয়াছে।' তিনি শবকে আর কিছু জিজ্ঞাসা না করিয়া, তাহাকে চাদর দিয়া বেশ করিয়া বাঁধিয়া শ্মশানে সন্ন্যাসীর কাছে লইয়া চলিলেন।

অর্ধেক পথ পার হইলে শবের ভূত বেতাল জিজ্ঞাসা করিল—"ওহে বীর পুরুষ! তুমি কে? আমাকে কি জন্য ও কোথায় লইয়া যাইতেছ?"

রাজা উত্তর করিলেন—"আমি রাজা বিক্রমাদিত্য। শান্তশীল নামে এক সন্ন্যাসীর অনুরোধে তোমাকে তাহার কাছে শ্মশানে লইয়া যাইতেছি।"

বেতাল বলিল—"মহারাজ! মূর্খ ও নির্বোধ লোকেরাই ঘুমাইয়া ও ঝগড়া-বিবাদ করিয়া বৃথা সময় কাটায়। কিন্তু পণ্ডিত ও বুদ্ধিমান লোকেরা সকল সময় শাস্ত্রচিন্তা ও সৎকাজ করিয়া দিন কাটাইয়া থাকেন। অতএব সমস্ত পথ চুপ করিয়া না গিয়া আমি তোমাকে গল্প বলিতেছি, শুন। প্রত্যেকটি গল্পের শেষে আমি তোমাকে প্রশ্ন করিব। তুমি যদি তাহার ঠিক ঠিক উত্তর দাও তাহা হইলে আমি আবার গিয়া গাছে উঠিব, আর, যদি জানিয়া-শুনিয়াও ভুল উত্তর দাও তাহা হইলে তোমার বুক ফাটিয়া যাইবে।"

আর কোন উপায় না দেখিয়া রাজা তাহাতেই সম্মত হইলেন। বেতাল তাহার গল্প আরম্ভ করিল।

প্রথম গল্প

বেতাল বলিল - "মহারাজ ! শুন—

বারাণসী নগরে প্রতাপমুকুট নামে ক্ষমতাশালী এক রাজা ছিলেন। তাঁহার রাণীর নাম ছিল মহাদেবী, আর, পুত্রের নাম বজ্রমুকুট। রাজা রাণী, রাজকুমারকে বড় ভালবাসিতেন। একদিন বজ্রমুকুট মন্ত্রিপুত্রের সঙ্গে বনে মৃগয়া করিতে বাহির হইলেন। বনে বনে ঘুরিয়া তাঁহারা অবশেষে এক গভীর বনে আসিয়া পড়িলেন। ঐ বনে একটি সুন্দর পুষ্করিণী ছিল। দুইজনেই পথশ্রমে বড় ক্লান্ত। পুষ্করিণীর তীরে একটি বকুল গাছ ছিল ; দুই বন্ধু বকুল গাছের তলায় তাঁহাদের ঘোড়া দুইটি বাঁধিয়া পুষ্করিণীতে মনের সাধে স্নান করিলেন। তারপর পুষ্করিণীর কাছেই মহাদেবের মন্দিরে গিয়া পূজা করিয়া কিছুক্ষণ পরে, প্রথমে রাজকুমার বাহির হইয়া আসিলেন।

সেই সময়ে এক পরমা সুন্দরী রাজকন্যাও তাঁহার সখীদের সঙ্গে পুষ্করিণীর অপর পাড়ে আসিয়া স্নান ও পূজা শেষ করিয়া গাছের ছায়ায় বেড়াইতেছিলেন। হঠাৎ রাজকুমার বজ্রমুকুট ও রাজকুমারীর —দুইজনের চোখোচোখি হইল ! রাজকুমারীর রূপে বজ্রমুকুট মোহিত হইলেন। রাজকুমারীও রাজকুমারকে দেখিয়া মুগ্ধ। তাঁহার মাথায় যে পদ্মফুলটি ছিল সেটি হাতে লইয়া তিনি প্রথমে তাঁহার কানে রাখিলেন। তারপর কান হইতে লইয়া দাঁত দিয়া কাটিয়া তাহা পায়ের নীচে ফেলিলেন। শেষে ফুলটি পায়ের নীচ হইতে তুলিয়া বুকে রাখিয়া রাজকুমারের দিকে বার বার চাহিতে চাহিতে সখীগণের সঙ্গে চলিয়া গেলেন।

রাজকুমারী চলিয়া গেলে বজ্রমুকুট বড়ই ব্যথিত ও অস্থির হইলেন। তিনি মন্ত্রিপুত্রের কাছে গিয়া বলিলেন—'বন্ধু ! আজ আমি একটি পরমা সুন্দরী মেয়ে দেখিয়াছি। কিন্তু সে কে,

কোথায় তাহার বাড়ী, কাহার মেয়ে এসব কিছুই জানি না। প্রতিজ্ঞা করিয়াছি তাহাকে বিবাহ করিতে না পারিলে প্রাণ বিসর্জন দিব।'

মন্ত্রিপুত্র রাজকুমারের কথা শুনিয়া তখনই তাঁহাকে লইয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন।

রাজকুমার তখন হইতে আহার-নিদ্রা ও অন্য কাজ-কর্ম ছাড়িয়া, নির্জনে একাকী বসিয়া থাকেন; কাহারও সঙ্গে মেলামেশা করেন না বা কথাবার্তা বলেন না। পরিশেষে তাঁহার এমন অবস্থা হইল যে, তিনি সেই রাজকুমারীর একখানি ছবি আঁকিয়া দিনরাত তাহার সম্মুখে বসিয়া কাটাইতে লাগিলেন।

একদিকে মন্ত্রিপুত্র বন্ধুর এই দুর্দশা দেখিয়া তাঁহাকে অনেক বুঝাইলেন, ভুলাইবার অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কোন ফল হইল না। রাজপুত্র তেমনি মলিন মুখে রাজকন্যার ছবির সম্মুখে একাকী বসিয়া থাকেন।

তখন মন্ত্রিপুত্র ভাবিলেন—'রাজপুত্রের যেমন অবস্থা দেখিতেছি, তাহাতে উপদেশ কিছুই হইবে না। এখন অন্য কোন উপায় ঠিক করা দরকার।' এই ভাবিয়া তিনি রাজকুমারকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'বন্ধু! যাইবার সময় সেই কন্যা কি তোমাকে কিছু বলিয়াছিল? তুমিও কিছু তাহাকে বলিয়াছিলে কি?'

রাজপুত্র বলিলেন—'না বন্ধু! আমিও তাঁহাকে কিছু বলি নাই; তিনিও আমাকে কিছু বলেন নাই।'

মন্ত্রিপুত্র বলিলেন—'তাহা হইলে তোমাদের মিলন কঠিন।'

রাজপুত্র বলিলেন—'সেই কন্যাকে বিবাহ করিতে না পারিলে, নিশ্চয়ই আমি জীবন বিসর্জন দিব।'

তখন মন্ত্রিপুত্র অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'আচ্ছা মেয়েটি যাইবার সময় কোন রকম সঙ্কেত করিয়াছিল কি?'

উত্তরে রাজপুত্র মন্ত্রিপুত্রের কাছে সেই পদ্মফুলের সকল কথা বলিলেন; শুনিয়াই মন্ত্রিপুত্র আনন্দে বলিয়া উঠিলেন—'বন্ধু! তোমার কোন ভাবনা নাই। আমি ঐ পদ্মফুলের কথা হইতে তাহার

বিষয় সবই জানিতে পারিয়াছি। শীঘ্রই তোমাদের মিলন ঘটাইয়া দিব। তুমি অধীর হইও না।'

রাজপুত্র বলিলেন—'বন্ধু! যাহা জানিতে পারিয়াছ, আমাকে বল। শুনিলেও কতকটা শান্ত হইতে পারিব।'

মন্ত্রিপুত্র বলিলেন—'মেয়েটি মাথা হইতে পদ্মফুলটি লইয়া কানে রাখিয়াছিল, তাহার দ্বারা সে তোমাকে জানাইয়াছিল,—যে কর্ণাট-নগরে তাহার বাস। দাঁত দিয়া কাটিয়া বুঝাইয়াছিল,—আমি দন্তবাট রাজার মেয়ে, তারপর পায়ের নীচে ফুলটি ফেলিয়া বুঝাইয়াছিল,—আমার নাম পদ্মাবতী; আর, শেষে ফুলটিকে বুকে তুলিয়া রাখার তাৎপর্য এই যে, সে বলিয়াছিল,—তোমাকে আমার মনে থাকিবে।'

মন্ত্রিপুত্রের কথা শুনিয়া রাজপুত্রের আনন্দের সীমা রহিল না। তিনি মন্ত্রিপুত্রকে বার বার বলিতে লাগিলেন—'বন্ধু! শীঘ্রই কর্ণাটনগরে চল!'

তখন দুইজনে অস্ত্র-শস্ত্র লইয়া ঘোড়ায় চড়িয়া কর্ণাটনগরে চলিলেন। কিছুদিন পরে তাঁহারা কর্ণাটনগরে গিয়া পৌঁছিলেন। নগরের পথ দিয়া যাইতে যাইতে রাজবাড়ীর কাছে গিয়া দেখিলেন, এক বৃদ্ধা তাহার বাড়ীর দরজায় চুপ করিয়া বসিয়া আছে। দুইজনে ঘোড়া হইতে নামিয়া তাহার কাছে গিয়া বলিলেন—'মা! আমরা বিদেশী বণিক। বাণিজ্যের জন্য এখানে আসিয়াছি। আমাদের জিনিস-পত্র সব পরে আসিতেছে। যদি দয়া করিয়া তোমার বাড়ীতে আমাদের থাকিতে দাও!'

বৃদ্ধা তাঁহাদের সুন্দর চেহারা ও মিষ্ট কথাবার্তা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইয়া বলিল,—'বাছারা! এ বাড়ী তোমাদেরই। যতদিন ইচ্ছা স্বচ্ছন্দে থাকিতে পার।'

দুইজনে বৃদ্ধার বাড়ীতে আশ্রয় লইলেন। কিছুক্ষণ পরে বৃদ্ধা আসিয়া দুই বন্ধুর সঙ্গে কথাবার্তা আরম্ভ করিল। মন্ত্রিপুত্র জিজ্ঞাসা করিলেন—'মা! তোমার আর কে আছে? তোমার সংসার কি করিয়া চলে?'

বৃদ্ধা বলিল,—'আমার ছেলে রাজ-সরকারে চাকুরী করে। রাজা তাহাকে বড় ভালবাসেন। পদ্মাবতী নামে রাজার এক মেয়ে আছে! আমি তাঁহার ধাত্রী ছিলাম। এখন বৃদ্ধা হইয়াছি ; সেইজন্য বাড়ীতেই থাকি। রাজা দয়া করিয়া অন্নবস্ত্র দেন। রাজকন্যা আমায় বড় ভালবাসেন। আমি রোজ তাঁহাকে একবার করিয়া দেখিতে যাই।'

রাজপুত্র বলিলেন,—'কাল যখন রাজবাড়ীতে যাইবে আমাকে বলিবে। আমি তাঁহার নিকট সংবাদ পাঠাইব।'

বৃদ্ধা বলিল,—'যদি দরকার থাকে বল ; আমি আজই রাজকন্যাকে জানাইয়া আসি।'

রাজকুমার এই কথা শুনিয়া আনন্দিত হইলেন ; বৃদ্ধাকে বলিলেন —'তুমি রাজকন্যাকে বলিবে, শুক্লাপঞ্চমীতে পুষ্করিণীর তীরে যে রাজকুমারকে দেখিয়াছিলে, সে তোমার সঙ্কেতমত নগরে উপস্থিত হইয়াছে।'

রাজকুমারের কথা শুনিবামাত্র বৃদ্ধা লাঠি ভর দিয়া রাজবাড়ীতে চলিল। সে অন্তঃপুরে গিয়া দেখিল, রাজকন্যা নির্জনে একাকিনী বসিয়া আছেন। বৃদ্ধা তাঁহার কাছে গেলে তিনি আদর করিয়া বসিতে আসন দিলেন। বৃদ্ধা রাজকন্যার সম্মুখে বসিয়া বলিল,—'বাছা! তোমাকে কত যত্নে মানুষ করিয়াছি। এখন বড় হইয়াছ। উপযুক্ত পাত্রের সঙ্গে তোমার বিবাহ হওয়া উচিত। শুক্লাপঞ্চমীতে পুষ্করিণীর ধারে যে রাজপুত্রকে দেখিয়াছিলে, তিনি তোমার সঙ্কেতমত আমার বাড়ীতে আসিয়াছেন। সব রকমেই তিনি তোমার উপযুক্ত।'

বৃদ্ধার কথা শুনিবামাত্র রাজকন্যা দুইহাতে চন্দন মাখাইয়া, বৃদ্ধার দুইগালে চড় মারিয়া তাঁহাকে অন্তঃপুর হইতে তাড়াইয়া দিলেন। বৃদ্ধা এইভাবে অপমানিত হইয়া বাড়ীতে আসিয়া রাজকুমারকে সকল কথা বলিল। তাহার কথা শুনিয়া রাজকুমার নিতান্ত হতাশ হইয়া মন্ত্রিপুত্রকে বলিলেন—'বন্ধু! এখন কি করি? আমার উপর রাজকন্যা বিরূপ। সেইজন্য তিনি বৃদ্ধাকে অপমান করিয়া তাড়াইয়া দিয়াছেন। আমাদের মিলনের আর কোন উপায় নাই।'



রাজকন্যা দুইহাতে চন্দন মাখাইয়া, বৃদ্ধার দুইগালে চড় মারিয়া…

মন্ত্রিপুত্র বলিলেন—'বন্ধু! তুমি রাজকুমারীর মনের কথা বুঝিতে না পারিয়া বৃথা খেদ করিতেছ। দুইহাতে চন্দন মাখাইয়া বৃদ্ধার দুইগালে চড় মারাতে, গালের উপর দশ আঙুলের দাগ পড়িয়াছে। ইহার অর্থ এই যে, শুক্লপক্ষের আর দশদিন বাকী। তাহার পর অর্থাৎ কৃষ্ণপক্ষে তাঁহার সঙ্গে তোমার দেখা হইবে।'

শুক্লপক্ষ শেষ হইল। বৃদ্ধা আবার রাজকন্যার কাছে গিয়া রাজকুমারের কথা বলিল। রাজকুমারী এবারও বৃদ্ধার উপর রাগিয়া গেলেন এবং তাহাকে ঘাড় ধরিয়া খিড়কীর দরজা দিয়া, বাড়ীর বাহির করিয়া দিলেন। বৃদ্ধা তৎক্ষণাৎ রাজকুমারের কাছে গিয়া সকল কথা জানাইল। শুনিয়া রাজকুমারের নৈরাশ্যের সীমা রহিল না। তিনি বিষণ্ণমুখে বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন।

ইহা দেখিয়া মন্ত্রিপুত্র বলিলেন—'বন্ধু! তোমার দুর্ভাবনার কোন কারণ নাই। রাজকুমারী ঘাড় ধরিয়া বৃদ্ধাকে খিড়কীপথে বাহির করিয়া দিয়া এই সঙ্কেত করিয়াছেন যে, তুমি আজ রাত্রিতে খিড়কী দিয়া অন্তঃপুরে যাইবে।'

মন্ত্রিপুত্রের কথা শুনিয়া রাজকুমার আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া সূর্য্যাস্তের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

তারপর রাত্রি আসিল। রাজপুত্র বরবেশে মন্ত্রিপুত্রের সঙ্গে রাজবাড়ীর অন্তঃপুরের খিড়কী-দরজায় উপস্থিত হইলেন। মন্ত্রিপুত্রকে বাহিরে রাখিয়া রাজপুত্র ভিতরে চলিয়া গেলেন। রাজকন্যাও অন্তঃপুরে বধূবেশে রাজপুত্রের প্রতীক্ষায় বসিয়া ছিলেন। দুইজনে দেখা-সাক্ষাৎ হইল। শেষে রাজকন্যার সখীগণের সম্মুখে মালা বদল করিয়া দুইজনের গন্ধর্বমতে বিবাহ হইয়া গেল। রাজকন্যা রাজপুত্রকে আর ছাড়িয়া দিলেন না, অন্তঃপুরেই রাখিয়া দিলেন। তখন হইতে মহাসুখে দুইজনের দিন কাটিতে লাগিল।

কিছুদিন যায়। একদিন রাজকুমার রাজকুমারীর কাছে দেশে ফিরিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। তিনি অনেকদিন দেশছাড়া, প্রিয়বন্ধু মন্ত্রিপুত্রও কাছে নাই, এজন্য মন বড়ই বিষণ্ণ। কিন্তু

রাজকুমারী কিছুতেই তাঁহাকে যাইতে দিলেন না।

তারপর আরও একমাস চলিয়া গেল। রাজপুত্র আরও বিষণ্ণ হইয়া পড়িলেন। একদিন তিনি নির্জনে বসিয়া ভাবিতেছেন—'আমি নিতান্ত নরাধম। না হইলে নিজের সুখের জন্য পিতা-মাতা, জন্মভূমি সবই ছাড়িলাম! মন্ত্রিপুত্রের মত প্রিয় বন্ধুরও কোন খবর লই না? না জানি, সে আমাকে কত স্বার্থপর ও অকৃতজ্ঞ ভাবিতেছে!'

এমন সময় রাজকন্যা সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি রাজকুমারকে বিষণ্ণ দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'তোমাকে এমন বিষণ্ণ দেখিতেছি কেন? তোমাকে বিষণ্ণ দেখিলে আমার বড় কষ্ট হয়। তোমার কি হইয়াছে বল।'

রাজকুমার বলিলেন—'অনেকদিন হইল আমার অতি প্রিয় বন্ধুর কোন খবর পাই না। তিনিই তোমার-আমার মিলন ঘটাইবার কারণ। জানি না তিনি কোথায় এবং কেমন আছেন।'

রাজকুমারী পদ্মাবতী বলিলেন—'প্রিয় বন্ধুকে না দেখিলে কষ্ট হওয়াই স্বাভাবিক। এতদিন তাঁহার কোন খবর না লওয়ায় বড়ই অন্যায় হইয়াছে! তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য আমি নিজ হাতে মিষ্টান্ন তৈয়ারী করিয়া পাঠাইব। তুমিও একবার কিছুক্ষণের জন্য তাঁহাকে গিয়া দেখিয়া আইস।'

রাজকুমার তৎক্ষণাৎ খিড়কীর দরজা দিয়া বাহির হইয়া বৃদ্ধার বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। অনেকদিন পরে বন্ধুর দেখা পাইয়া তাঁহার আনন্দের সীমা রহিল না। দুইজন অনেক কথা হইল।

এদিকে রাজপুত্রকে বন্ধুর কাছে পাঠাইয়া রাজকন্যা মনে মনে ভাবিলেন—'রাজকুমার নিশ্চয়ই বন্ধুর কাছে সকল কথা বলিবেন। মন্ত্রিপুত্রও আবার তাঁহার অন্য বন্ধু-বান্ধবের কাছে আমাদের গোপনে বিবাহের কথা বলিয়া বেড়াইবেন। ক্রমে তাহা আমার পিতা-মাতা ও অন্যান্য গুরুজনদের কানে উঠিবে। শুনিয়া তাঁহারা আমার উপর রাগ করিবেন। অতএব মন্ত্রিপুত্রকে জীবিত রাখা কোনমতেই উচিত নহে।' এইরূপ স্থির করিয়া রাজকন্যা বিষ মিশাইয়া নানারকম পিষ্টক তৈয়ারী

করিয়া তাঁহার এক সখীকে দিয়া তাহা রাজকুমারের কাছে পাঠাইয়া দিলেন।

খাবার দেখিয়া মন্ত্রিপুত্র রাজকুমারকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'বন্ধু! এ সব কি ?'

রাজপুত্র মন্ত্রিপুত্রের কাছে আসিবার আগে যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা প্রকাশ করিলেন ; তারপর বলিলেন—'বন্ধু! রাজকন্যা নিজের হাতে তোমার জন্য এই সব খাবার তৈয়ারী করিয়া পাঠাইয়াছেন। আমার সম্মুখে তুমি কিছু খাও ; তাহা হইলে আমি খুবই খুশী হইব। আর তাঁহাকে গিয়া বলিতে পারিব, তুমি খাবার খাইয়া তাঁহাকে খুব প্রশংসা করিয়াছ।'

রাজকুমারের কথা শুনিয়া মন্ত্রিপুত্র কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। তারপর আবার রাজপুত্রের মুখে সকল কথা শুনিয়া বলিলেন —'বন্ধু! তুমি আমার জন্য বিষ আনিয়াছ। ঐ খাবার খাইবামাত্র মৃত্যু হইবে। আমার পরম সৌভাগ্য যে, তুমি উহা খাও নাই।'

রাজকুমার বলিলেন—'বন্ধু! তোমার কথা আমি বিশ্বাস করিতে পারি না। তুমি তাঁহাকে জান না, সেইজন্য এমন কথা বলিতেছ। তাঁহার নামে এমন দোষ দেওয়া বড়ই অন্যায়। যাহা হউক, তোমার সম্মুখেই আমি সন্দেহ দূর করিতেছি—' এই বলিয়া একটি লাড়ু লইয়া রাজকুমার একটা বিড়ালকে খাইতে দিলেন। বিড়াল লাড়ুটি মুখে দিবামাত্র মরিয়া গেল। ইহা দেখিয়া রাজপুত্র অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন ; বলিলেন—'এমন পাপিষ্ঠার মুখ দেখাও পাপ। জীবনে আমি আর তাহার মুখ দেখিব না।'

মন্ত্রিপুত্র বলিলেন—'না বন্ধু! তাহাকে একেবারে ত্যাগ করা হইবে না ; কৌশলে আমাদের রাজধানীতে লইয়া যাইতে হইবে।'

রাজকুমার বলিলেন—'তুমি যেমন বলিবে, আমি তাহাই করিব।'

মন্ত্রিপুত্র বলিলেন—'এক কাজ কর। তুমি রাজকন্যার কাছে ফিরিয়া গিয়া বল, মন্ত্রিপুত্র তোমার তৈয়ারী খাবার খাইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন। আমি তোমাকে না দেখিয়া বেশীক্ষণ থাকিতে পারি না ;

সেজন্য তাঁহার ঘুম ভাঙ্গা অবধি অপেক্ষা না করিয়া চলিয়া আসিয়াছি। তারপর রাত্রে রাজকন্যা যখন ঘুমাইবেন, তখন তাঁহার সমস্ত অলঙ্কার লইয়া, তাঁহার বাঁ পায়ে ত্রিশূলের চিহ্ন দিয়া আমার কাছে চলিয়া আসিও।'

বন্ধুর কথায় সম্মত হইয়া রাজকুমার রাজকন্যার কাছে গেলেন এবং রাত্রে রাজকন্যা ঘুমাইলে বন্ধুর পরামর্শ মত সমস্ত কাজ শেষ করিয়া, বৃদ্ধার বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন।

পরদিন সকালের মন্ত্রিপুত্র এক শ্মশানে গিয়া নিজে গুরু সাজিলেন ও রাজপুত্রকে তাঁহার শিষ্য সাজাইয়া বলিলেন—'তুমি নগরে গিয়া এই সমস্ত অলঙ্কার বিক্রয় করিয়া আইস। যদি কেহ তোমাকে চোর বলিয়া সন্দেহ করে, তাহাকে আমার কাছে লইয়া আসিবে।'

রাজপুত্র বন্ধুর কথামত অলঙ্কারগুলি বিক্রয়ের জন্য এক স্বর্ণকারের দোকানে উপস্থিত হইলেন। স্বর্ণকার অলঙ্কারগুলি দেখিয়া বড় বিস্মিত হইল। সে মনে মনে ভাবিতে লাগিল,—'এ সকল অলঙ্কার এই যুবক পাইল কোথা হইতে? কিছুদিন আগে রাজকন্যার জন্য আমি এগুলি প্রস্তুত করিয়াছিলাম। দেখিতেছি লোকটা বিদেশী। অলঙ্কারগুলি কি এ চুরি করিয়াছে?' সে রাজপুত্রকে জিজ্ঞাসা করিল—'এসকল গহনা তুমি কোথায় পাইলে? এগুলি যে রাজকন্যার গহনা। নিশ্চয়ই তুমি চুরি করিয়াছ।'

স্বর্ণকারের কথাবার্তা শুনিয়া তাহার দোকানের সম্মুখে একে একে বহু লোক জমিয়া গেল। শেষে নগরপালের কাছে এই খবর পৌঁছিলে সে আসিয়া দুইজনকেই ধরিল; তারপর রাজপুত্রকে জিজ্ঞাসা করিল—'এসকল অলঙ্কার তুমি কোথায় পাইলে?'

রাজপুত্র বলিলেন—'আমার গুরুদেব শ্মশানে বাস করেন; তিনিই আমাকে গহনাগুলি বিক্রয় করিতে পাঠাইয়াছেন। কিন্তু তিনি কোথায় এগুলি পাইলেন, আমি তাহার কিছুই জানি না।'

রাজপুত্রের কথা শুনিয়া নগরপাল শ্মশানে গিয়া তাঁহার গুরুদেবকে ধরিল এবং অলঙ্কারের সহিত তাঁহাদের সকলকে রাজার কাছে উপস্থিত

করিয়া, সকল কথা জানাইল।

অলঙ্কার দেখিয়া রাজার মনে অনেক রকম সন্দেহ দেখা দিল। তিনি যোগীকে নির্জনে লইয়া গিয়া অতি বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন —'মহাশয় ? এই সকল অলঙ্কার আপনি কোথায় পাইলেন ?'

যোগী বলিলেন—'মহারাজ ! গত কৃষ্ণচতুর্দ্দশী রাত্রে আমি নগরের শেষে শ্মশানে ডাকিনীমন্ত্র সাধন করিয়াছিলাম। আমার মন্ত্রের বলে ডাকিনী নিজে আসিয়া সিদ্ধিলাভের ফলস্বরূপ তাঁহার এই অলঙ্কারগুলি আমাকে দিয়া গিয়াছেন। আমিও তাঁহার বাঁ পায়ে ত্রিশূলের চিহ্ন করিয়া দিয়াছি।'

যোগীর কথায় রাজা অবাক হইয়া তৎক্ষণাৎ অন্তঃপুরে গিয়া রাণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন— 'দেখ দেখি, পদ্মাবতীর বাঁ পায়ে কোন চিহ্ন আছে কিনা ?'

রাণী দেখিয়া আসিয়া বলিলেন—'হাঁ, একটি ত্রিশূলের চিহ্ন আছে।'

রাণীর কথা শুনিয়া রাজা লজ্জায় মাথা হেঁট করিয়া ভাবিতে লাগিলেন—'এমন ডাকিনী মেয়েকে বাড়ীতে রাখা কখনই উচিত নহে। ইহাতে অধর্ম আছে। কিন্তু এখন কি কর্তব্য ? পণ্ডিতদের জিজ্ঞাসা করিলে, ঘরের কথা প্রকাশ হইয়া পড়িবে। তাহা করা কখনই উচিত নহে। ঐ যোগীকেই জিজ্ঞাসা করা যাক। উনি ত সবই জানেন। উহার কাছে আর কি প্রকাশ হইবে ?'

পদ্মাবতীকে এখন কি করা উচিত যোগীকে জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিলেন—'মহারাজ ! ধর্মশাস্ত্রে আছে স্ত্রীলোক গুরুতর দোষ করিলেও তাহাকে বধ করিতে নাই। রাজা তাহাকে নির্বাসন-দণ্ড দিবেন।'

যোগীর কথামত রাজা অন্তঃপুরে গিয়া রাণীর কাছে সকল কথা বলিলেন ও তাঁহাকে অনেক বুঝাইয়া তাঁহার সম্মতি লইয়া, রাজকুমারীকে নির্বাসন-দণ্ড দিলেন। রাজার আদেশমত বাহকগণ পদ্মাবতীকে পাল্কীতে চড়াইয়া এক গভীর বনে রাখিয়া আসিল।

ওদিকে মন্ত্রিপুত্রও রাজপুত্রকে লইয়া পদ্মাবতীর উদ্দেশে চলিলেন।

বনে বনে খুঁজিয়া তাঁহারা সেই বনে গিয়া দেখিলেন, পদ্মাবতী একটি গাছের তলায় একাকী বসিয়া কাঁদিতেছেন। দুইজনে অনেক করিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া আপনাদের রাজধানীতে লইয়া আসিলেন। প্রজারা তাঁহাদের দেখিয়া আনন্দিত হইল। রাজা প্রতাপমুকুট পুত্র ও পুত্র-বধূর মুখ দেখিয়া আনন্দে তাহাদের আশীর্বাদ করিলেন। তাঁহার আদেশে নগরে মহোৎসব আরম্ভ হইল।"...

গল্প শেষ করিয়া বেতাল জিজ্ঞাসা করিল—"মহারাজ! রাজপুত্র ও মন্ত্রিপুত্রের মধ্যে বিনাদোষে নিরপরাধিনী রাজকন্যার নির্বাসনের জন্য কে দায়ী?"

বিক্রমাদিত্য বলিলেন—"আমার মতে রাজা দন্তবাট।"

—"কেন?"

—"শাস্ত্রে আছে, শত্রুকে বধ করিলে পাপ হয় না। মন্ত্রিপুত্রকে বধ করিতে রাজকুমারী বিষ মিশাইয়া খাবার তৈয়ার করিয়াছিলেন। কাজেই রাজকুমারীর প্রতি মন্ত্রিপুত্রের ঐ রকম ব্যবহার দোষের নয়। কিন্তু রাজা একজন অজানা অচেনা লোকের কথায় বিশ্বাস করিয়া, কোনরকম খোঁজখবর লইলেন না; কন্যার প্রতি স্নেহ-মমতা সব ভুলিয়া বিনাদোষে তাহাকে নির্বাসন-দণ্ড দিলেন—ইহাতে রাজধর্মের বিরুদ্ধে কাজ করা হইয়াছে। ফলে তাঁহার পাপ হইতে পারে।"

ইহা শুনিয়া বেতাল তাহার প্রতিজ্ঞামত শ্মশানে ফিরিয়া গিয়া, আবার শিরীষ গাছে ঝুলিতে লাগিল। রাজাও তাহার পিছনে ছুটিয়া তাহাকে গাছ হইতে নামাইলেন এবং আগের মত কাঁধে করিয়া সন্ন্যাসীর কাছে চলিলেন।

দ্বিতীয় গল্প

বেতাল বলিল—"মহারাজ! দ্বিতীয় গল্প বলিতেছি, শুন—

যমুনাতীরে জয়স্থল নামে একটি নগর আছে। সেখানে কেশব নামে খুব ধার্মিক এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার মধুমালতী নামে এক পরমা সুন্দরী কন্যা ছিল। ঐ মেয়ের বিবাহের বয়স হইলে ব্রাহ্মণ ও তাঁহার পুত্র মেয়েটির জন্য পাত্র খুঁজিতে লাগিলেন।

কিছুদিন পরে ব্রাহ্মণের এক যজমানের ছেলের বিবাহের জন্য ব্রাহ্মণকে অন্য গ্রামে যাইতে হইল। ব্রাহ্মণের ছেলেও লেখাপড়া করিবার জন্য গুরুগৃহে চলিয়া গেলেন। এই সময়ে ত্রিবিক্রম নামে একটি ব্রাহ্মণের ছেলে আসিয়া তাঁহাদের বাড়ীতে অতিথি হইলেন। ত্রিবিক্রমের যেমন বিদ্যাবুদ্ধি তেমনই রূপ। তাঁহাকে দেখিয়া কেশবের স্ত্রী ভাবিলেন—'আহা! ছেলেটি বেশ। এ যদি ভাল বংশে জন্মিয়া থাকে, আর, আমার মধুমালতীকে বিবাহ করিতে রাজী হয়, তাহা হইলে ইহাকেই আমার জামাতা করিব।' তারপর খুব আদর যত্নের সহিত ত্রিবিক্রমকে খাওয়াইয়া ব্রাহ্মণী তাঁহাকে ঘরের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। উত্তরে জানিলেন, সে সৎবংশের ছেলে। তখন ব্রাহ্মণী আনন্দিত হইয়া বলিলেন—'তুমি স্বীকার কর, তোমার সঙ্গে আমার মেয়ে মধুমালতীর বিবাহ দি।'

ত্রিবিক্রম মধুমালতীর রূপ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন। সেজন্য তিনি ব্রাহ্মণীর প্রস্তাবে রাজী হইয়া ব্রাহ্মণের অপেক্ষায় সেখানেই থাকিয়া গেলেন।

কিছুদিন পরে কেশব ও তাঁহার পুত্র, মধুমালতীর জন্য এক একটি বর লইয়া বাড়ী ফিরিলেন। এখন মধুমালতীর জন্য তিনটি পাত্র হইল। প্রথমটির নাম ত্রিবিক্রম, দ্বিতীয়টির নাম বামন, তৃতীয়টির নাম মধুসূদন। তিনজনই রূপেগুণে সমান। কেশব মহা দুর্ভাবনায়

পড়িলেন। তিনটি পাত্রের কাছেই তাঁহারা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। এখন কাহার হাতে মধুমালতীকে দান করা যায়?

ব্রাহ্মণ বসিয়া বসিয়া এইসব ভাবিতেছেন, এমন সময় ব্রাহ্মণী আসিয়া বলিলেন—'তুমি এখানে বসিয়া ভাবিতেছ কি? ওদিকে যে মধুমালতীকে সাপে কামড়াইয়াছে!'

ব্রাহ্মণ মহাব্যস্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ চার-পাঁচজন বিষ-বৈদ্য আনিয়া মধুমালতীর কতরকম চিকিৎসা করাইলেন; কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। বৈদ্যেরা বলিল—'ইহাকে বাঁচান যাইবে না।' মধুমালতীর মৃত্যু হইল। তখন পিতা, পুত্র ও তিন পাত্র মিলিয়া মধুমালতীর দেহ শ্মশানে লইয়া গিয়া পোড়াইয়া ফেলিলেন।

এমন ব্যাপারে তিনটি পাত্রই বিরাগী হইলেন। ত্রিবিক্রম চিতা হইতে মধুমালতীর অস্থি লইয়া দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। বামন তীর্থযাত্রা করিলেন; আর, মধুসূদন সেই শ্মশানের একধারে কুটীর বাঁধিলেন এবং তাহার মধ্যে মধুমালতীর ভস্ম রাখিয়া যোগসাধনা করিতে লাগিলেন।

একদিন দ্বিপ্রহরে বামন ঘুরিতে ঘুরিতে এক গৃহস্থ ব্রাহ্মণের বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত। আহারের সময় অতিথি দেখিয়া ব্রাহ্মণ হাত-জোড় করিয়া বলিলেন—'মহাশয়! গরীবের বাড়ীতে যখন পায়ের ধূলা দিয়াছেন তখন দয়া করিয়া দুটি আহার করুন—রান্না প্রায় হইয়া আসিল।'

বামন ব্রাহ্মণের কথায় রাজী হইয়া রান্না হইলে আহারে বসিলেন। ব্রাহ্মণী পরিবেষণ করিতে লাগিলেন। এমন সময় ব্রাহ্মণের পাঁচ বছরের ছেলেটি সেখানে আসিয়া উৎপাত আরম্ভ করিল। ব্রাহ্মণী ছেলেটিকে অনেক রকমে শান্ত করিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু ছেলেটি কিছুতেই শান্ত হইল না। তখন ব্রাহ্মণী রাগিয়া তাহাকে জ্বলন্ত উনানের মধ্যে ফেলিয়া দিয়া, নিশ্চিন্ত মনে পরিবেষণ করিতে লাগিলেন।

এমন ভয়ঙ্কর ব্যাপার দেখিয়া বামন আর খাইতে পারিলেন না; হতভম্বের মত বসিয়া রহিলেন। ইহা দেখিয়া ব্রাহ্মণ বলিলেন—

'মহাশয়! আপনি হঠাৎ খাওয়া বন্ধ করিলেন কেন?'

বামন বলিলেন—'এমন ভয়ঙ্কর কাণ্ড দেখিয়া কাহার খাইতে প্রবৃত্তি হয়?'

ব্রাহ্মণ হাসিয়া তখনই ঘরের মধ্যে গেলেন এবং সঞ্জীবনী-বিদ্যার পুস্তক বাহির করিয়া, তাহার মধ্য হইতে একটি মন্ত্র লইয়া জপ করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণের ছেলেটি তৎক্ষণাৎ বাঁচিয়া উঠিয়া আবার উৎপাত আরম্ভ করিল।

বামন ব্রাহ্মণের কাণ্ড দেখিয়া অবাক। তিনি আহার শেষ করিলেন। তারপর মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন—'এই পুস্তকে সঞ্জাবনী-মন্ত্র আছে; ঐ মন্ত্র জানিতে পারিলে মধুমালতীকে বাঁচাইতে পারিব। অতএব যেমন করিয়াই হউক, পুস্তকখানি সংগ্রহ করিতে হইবে।'

এইরূপ স্থির করিয়া বামন ব্রাহ্মণকে বলিলেন—'মহাশয়! বেলা পড়িয়া আসিল। রাত্রিতে আর কোথায়ও না গিয়া আপনার বাড়িতেই থাকিব।'

ব্রাহ্মণ খুব আদর করিয়া অতিথির থাকিবার জায়গা করিয়া দিলেন। রাত্রি হইল। খাইয়া সকলে যখন গভীর নিদ্রায় মগ্ন, বামন তখন চুপি চুপি ঘরে প্রবেশ করিয়া সঞ্জীবনী-বিদ্যার পুস্তকখানি লইয়া চলিয়া গেলেন।

কিছুদিন পরে জয়স্থলের সেই শ্মশানে উপস্থিত হইয়া বামন দেখিলেন, মধুসূদন কুটীরে বসিয়া যোগসাধন করিতেছেন। এই সময়ে দৈবাৎ ত্রিবিক্রমও সেখানে উপস্থিত হইলেন। এইভাবে তিনজন একত্র হইলে, বামন বলিলেন—'আমি সঞ্জীবনী-বিদ্যা শিখিয়াছি। তোমরা মধুমালতীর অস্থি ও ভস্ম একত্র কর, আমি তাহাকে বাঁচাইব।'

তাঁহার কথায় ব্যস্ত হইয়া ত্রিবিক্রম ও মধুসূদন মধুমালতীর অস্থি ও ভস্ম একত্র করিলেন। বামন সঞ্জীবনী-মন্ত্র পড়িতে লাগিলেন। তাহার বলে মধুমালতী বাঁচিয়া উঠিল। তখন তিনজনেই মধুমালতীকে বিবাহ করিবার জন্য পরস্পর ঝগড়া করিতে লাগিলেন।"...

ইহা বলিয়া বেতাল বিক্রমাদিত্যকে জিজ্ঞাসা করিল—"মহারাজ! ঐ তিনজনের মধ্যে মধুমালতীকে বিবাহ করিবার অধিকারী কে?"

রাজা বলিলেন—"যে শ্মশানে কুটীর বাঁধিয়া বাস করিতেছিল, আমার মতে সে।"

—"কেন? ত্রিবিক্রম যদি মধুমালতীর অস্থি না রাখিত এবং বামন সঞ্জীবনী-বিদ্যা না সংগ্রহ করিত, তাহা হইলে মধুমালতী বাঁচিত কি করিয়া?"

রাজা বলিলেন—"তুমি যাহা বলিতেছ, তাহা ঠিক। কিন্তু পুত্রই পিতা-মাতার অস্থি সঞ্চয় করে; সুতরাং ত্রিবিক্রম মধুমালতীর পুত্র-স্থানীয় হইয়াছে। আর বামন তাহার জীবনদান করিয়া তাহার পিতৃস্থানীয় হইয়াছে। কাজেই তাহারা মধুমালতীকে কিরূপে বিবাহ করিতে পারে? মধুসূদন ভস্ম লইয়া শ্মশানে বাস করিয়া তাহাকে বিবাহ করিবার অধিকারী হইয়াছে।"

ইহা শুনিয়া বেতাল ইত্যাদি—

তৃতীয় গল্প

বেতাল বলিল—"মহারাজ! শুন—

বর্ধমান নগরে রূপসেন নামে একজন বিদ্বান, ধার্মিক ও দানশীল, রাজা ছিলেন। একদিন বীরবর নামে একজন রাজপুত তাঁহার কাছে চাকরীর জন্য আসিল। দ্বারবান তাহার কথা রাজার কাছে গিয়া বলিলে, রাজা বলিলেন,—'তাহাকে এখনই আমার কাছে লইয়া আইস।'

দ্বারবান বীরবরকে রাজার কাছে লইয়া গেলে রাজা বীরবরের আকৃতি দেখিয়া বুঝিলেন, লোকটি কাজের হইবে। তিনি বীরবরকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'কত টাকা মাহিনা পাইলে তোমার চলিতে পারে?'

বীরবর বলিল—'মহারাজ! প্রত্যহ সহস্র স্বর্ণমুদ্রা পাইলে আমার চলিবে।'

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন—'তোমার পরিবারে কতজন লোক ?'

বীরবর বলিল—'এক স্ত্রী, এক পুত্র, এক কন্যা, আর আমি স্বয়ং। আমার পরিবারে মাত্র এই চারিজন লোক।'

বীরবরের কথা শুনিয়া রাজা মনে মনে ভাবিলেন—ইহার পরিবারে মাত্র চারিজন লোক! তবে এ কেন এত টাকা বেতন চাহিতেছে? একটি মাত্র চাকরের জন্য এত-বেশী খরচ করা উচিত নহে। হয়ত লোকটির কোন অসাধারণ গুণ আছে। যাহা হউক, ইহাকে কিছুদিন রাখিয়া ইহার গুণ ও ক্ষমতা পরীক্ষা করিয়া দেখিব।' এই স্থির করিয়া রাজা বীরবরকে নিযুক্ত করিলেন।

বীরবর প্রথম যে বেতন পাইল, তাহা দুইভাগ করিয়া তাহার এক-ভাগ ব্রাহ্মণকে দান করিল। বাকী অংশ আবার দুইভাগ করিয়া একভাগ সাধু-সন্ন্যাসীকে দিল। তাহার পর অপর অংশ দ্বারা নানা-রকম ভাল খাবার তৈয়ারী করিয়া গরীব-দুঃখীদের খাওয়াইল এবং অবশিষ্ট যৎসামান্য নিজেরা খাইল।

বীরবর প্রতিদিন এইভাবে দান-ধ্যান করে। তাহার পর, সন্ধ্যা-বেলা অস্ত্র-শস্ত্র লইয়া রাজবাড়ীর দরজায় সমস্ত রাত্রি পাহারা দেয়, রাজা তাহার শক্তি ও প্রভুভক্তি পরীক্ষার জন্য যখন যে আদেশ দেন, অত্যন্ত কঠিন হইলেও বীরবর তৎক্ষণাৎ তাহা পালন করে।

একদিন গভীর রাত্রে হঠাৎ স্ত্রীলোকের কান্না শুনিতে পাইয়া রাজা বীরবরকে ডাকিলেন। বীরবর তৎক্ষণাৎ রাজার সম্মুখে উপস্থিত হইল।

রাজা বলিলেন—'দক্ষিণদিকে স্ত্রীলোকের কান্না শোনা যাইতেছে। ইহার কারণ জানিয়া আসিয়া আমাকে বল।'

বীরবর 'যে আজ্ঞা মহারাজ!' বলিয়া তৎক্ষণাৎ চলিয়া গেল। রাজাও কৌতূহলের বশে গোপনে বীরবরের পিছন পিছন চলিলেন।

বীরবর সেই কান্নার শব্দ লক্ষ্য করিয়া চলিতে চলিতে এক ভয়ঙ্কর শ্মশানে উপস্থিত হইল; সেখানে গিয়া দেখিল, এক পরমা সুন্দরী স্ত্রীলোক কপালে করাঘাত করিয়া হাহাকার করিয়া কাঁদিতেছে।

তাহাকে দেখিয়া বীরবরের বড় আশ্চর্য্য বোধ হইল। সে তাহার কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল—'তুমি কে? কি দুঃখে এই ঘোর রাত্রে একাকিনী শ্মশানে বসিয়া কাঁদিতেছ?'

স্ত্রীলোকটি কোন উত্তর দিল না; বরং আরও কাঁদিতে লাগিল।

তখন বীরবর অনেক অনুনয়-বিনয়ের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল—'আমি রাজলক্ষ্মী। রাজা রূপসেনের বাড়ীতে অনেক অন্যায় অত্যাচার হইতেছে। সেজন্য রাজবাড়ীতে শীঘ্রই অলক্ষ্মী প্রবেশ করিবে। অলক্ষ্মী প্রবেশ করিলে আমি চলিয়া যাইব। আমি চলিয়া গেলে, অল্পদিনের মধ্যেই রাজার মৃত্যু ঘটিবে। সেই দুঃখে আমি কাঁদিতেছি।'

প্রভুর এই রকম অমঙ্গলের কথা শুনিয়া বীরবর দুঃখিত হইয়া বলিল—'দেবি! আপনি যাহা বলিলেন, তাহাতে সন্দেহ করিতে পারি না। কিন্তু যদি অমঙ্গল হইতে রাজাকে বাঁচাইবার কোন উপায় থাকে বলুন। আমি রাজার মঙ্গলের জন্য প্রাণ দিতেও প্রস্তুত।'

রাজলক্ষ্মী বলিলেন—'পূর্বদিকে অর্দ্ধযোজন দূরে এক দেবী আছেন। যদি কেহ ঐ দেবীর কাছে নিজের ছেলেকে নিজের হাতে বলি দেয়, তবে দেবী সন্তুষ্ট হইয়া রাজার অমঙ্গল দূর করিতে পারেন।'

রাজলক্ষ্মীর এই কথা শুনিয়া বীরবর তৎক্ষণাৎ তাহার বাড়ীর দিকে ছুটিল। বীরবর বাড়ী পৌঁছিয়া স্ত্রীকে জাগাইয়া সব কথা বলিলে, সে তৎক্ষণাৎ ছেলেকে জাগাইয়া বলিল—'বৎস! দেবীর কাছে তোমাকে বলি দিলে রাজা দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া অনেকদিন রাজত্ব করিতে পারিবেন।'

পুত্র বলিল—'মা! একদিন ত মরিতেই হইবে। সেজন্য যদি জীবনটা দেবসেবায় লাগাইতে পারি এবং তাহাতে যদি রাজার মঙ্গল হয়, তবে আমার পক্ষে প্রাণত্যাগের ইহাই সুসময়। অতএব এমন শুভকর্মে আপনারা দেরী করিবেন না, শীঘ্র কাজ শেষ করুন।'

বীরবর পুত্রের এই অপূর্ব কথাগুলি শুনিয়া বিস্মিত হইল। সে সজল চোখে তাহার স্ত্রীকে বলিল—'তুমি যদি সন্তুষ্টমনে পুত্রকে দান

কর, তবেই আমি তাহাকে বলিদান দিয়া রাজার উপকার করিতে পারি—’

স্ত্রী সন্তুষ্টচিত্তে মত দিলে, বীরবর তাহাদের সকলকে লইয়া দেবীর মন্দিরে চলিল। বীরবর ও তাহার পরিবারের প্রভুভক্তি দেখিয়া রাজা চমৎকৃত ও আনন্দিত হইলেন। তিনি তাহাদের সকলকে প্রচুর ধন্যবাদ দিতে দিতে গোপনে তাহাদের পিছন পিছন চলিলেন।

কিছুক্ষণ পরে সকলে দেবীর মন্দিরে পৌঁছিল। বীরবর যথাবিধি দেবীর পূজা করিয়া করজোড়ে দেবীকে বলিল—‘জগদীশ্বরি! তোমাকে সন্তুষ্ট করিতে নিজের হাতে আমার প্রাণের চেয়ে প্রিয় পুত্রকে বলি দিতেছি। মা! দয়া কর, যেন আমার প্রভুর জীবন দীর্ঘ হয়।’

এই বলিয়া বীরবর খড়্গ দিয়া পুত্রের মাথা কাটিয়া ফেলিল। বীরবরের মেয়ে প্রিয় ভ্রাতার মৃত্যু দেখিয়া দুঃখে সেই খড়্গ দিয়া নিজের মাথা কাটিল। বীরবরের স্ত্রীও পুত্র-কন্যার মৃত্যুতে পাগল হইয়া তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করিল। তখন বীরবর ভাবিল—‘প্রভুর কার্য শেষ করিলাম; এখন স্ত্রী-পুত্র-কন্যাকে হারাইয়া কি সুখে আর বাঁচিয়া থাকি?’ এই ভাবিয়া সেও সেই খড়্গ দিয়া নিজের মাথা কাটিয়া ফেলিল।

অল্পক্ষণের মধ্যে এমন ভয়ঙ্কর কাণ্ড দেখিয়া রাজার মনে বৈরাগ্য জন্মিল। তিনি ভাবিলেন—‘যে রাজ্যের জন্য এমন প্রভুভক্ত ভৃত্যের সর্বনাশ হইল, সে রাজ্য-ভোগে আমার আর ইচ্ছা নাই। আমি নিতান্ত স্বার্থপর ও অবিবেচক না হইলে কেন বীরবরকে পুত্র-হত্যায় বাধা দিলাম না? কেনই বা তাহাকে আত্মহত্যা করিতে দিলাম? প্রথমেই বীরবরকে এমন ভয়ঙ্কর কাজে নিষেধ করা আমার উচিত ছিল। আমি খুবই খারাপ কাজ করিয়াছি। এখন আত্মহত্যা করিয়া ইহার প্রায়শ্চিত্ত করিব।’

এই ভাবিয়া রাজা সেই খড়্গ দিয়া নিজের মাথা কাটিবার উপক্রম করিতেই দেবী রাজার হাত ধরিয়া তাঁহাকে নিরস্ত করিলেন এবং বলিলেন--‘বৎস! আমি তোমার সাহস ও শুভ বুদ্ধি দেখিয়া বড়ই সন্তুষ্ট হইয়াছি। তোমার যাহা ইচ্ছা বর চাও।’

রাজা বলিলেন—'মা ! যদি সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন, তাহা হইলে এই চারিজনের জীবন দান করুন।'

দেবী 'তথাস্তু' বলিয়া তৎক্ষণাৎ চারিজনকে বাঁচাইয়া দিলেন। ইহাতে রাজার আনন্দের সীমা রহিল না। তিনি সাষ্টাঙ্গে দেবীকে প্রণাম করিয়া ভক্তিগদগদকণ্ঠে তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। দেবী সন্তুষ্ট হইয়া রাজাকে আরও বর দিয়া অদৃশ্য হইলেন।

পরদিন সকালে রাজা রূপসেন সভায় সিংহাসনে বসিয়া সকলের সম্মুখে বীরবরকে অর্দ্ধেক রাজত্ব দান করিলেন।"...

গল্প শেষ করিয়া বেতাল জিজ্ঞাসা করিল—"মহারাজ! বল দেখি, এই ব্যাপারে কাহার মহত্ত্ব বেশী ?"

বিক্রমাদিত্য বলিলেন—"আমার মতে রাজা রূপসেনের।"

—"কেন ?"

—"কেননা প্রভুর জন্য ভৃত্যের ত্যাগ-স্বীকার করাই কর্তব্য। বীরবর তাহার যাহা কর্তব্য তাহাই করিয়াছে। কিন্তু রাজা যে ভৃত্যের জন্য এমন একটি রাজ্য তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া অনায়াসেই নিজের প্রাণ দিতে উদ্যত হইলেন, এমন মহত্ত্ব কখনও শুনি নাই।"

ইহা শুনিয়া বেতাল ইত্যাদি—

চতুর্থ গল্প

বেতাল চতুর্থ গল্প বলিতে আরম্ভ করিল; বলিল—"মহারাজ! ভোগবতী নগরে অনঙ্গসেন নামে এক বিখ্যাত রাজা ছিলেন। তাঁহার একটি শুকপক্ষী ছিল। তাহার নাম চূড়ামণি। পাখীটিকে রাজা বড় ভালবাসিতেন। পাখীটি সকল সময়ে রাজার কাছে থাকিত। একদিন রাজা কথায় কথায় পাখীটিকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'পাখী! তুমি কি কি বিষয় জান ?'

শুক বলিল—'মহারাজ! আমি ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান সকল

সময়ের সংবাদ বলিতে পারি।'

রাজা বলিলেন—'তাহা হইলে বল দেখি, আমি বিবাহ করিতে পারি এমন কন্যা কোথায় আছে?'

চূড়ামণি বলিল—'মহারাজ! মগধদেশের রাজা বীরসেনের চন্দ্রাবতী নামে যে মেয়ে আছে, তাহার সহিত আপনার বিবাহ হইবে। মেয়েটি পরমা-সুন্দরী ও অত্যন্ত গুণবতী।'

রাজা শুকের কথা পরীক্ষা করিবার জন্য প্রসিদ্ধ গণক চন্দ্রকান্তকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'বলুন দেখি, কোন্ কন্যার সঙ্গে আমার বিবাহ হইবে?'

গণক গণনায় জানিয়া বলিলেন—'মহারাজ! চন্দ্রাবতী নামে এক পরমাসুন্দরী রাজকন্যা আপনার রাণী হইবেন।'

ইহা শুনিয়া রাজা শুকের প্রতি সন্তুষ্ট হইলেন। পরে একজন চতুর ঘটককে মগধের রাজার কাছে পাঠাইলেন।

চন্দ্রাবতীর কাছেও মদনমঞ্জরী নামে এক শারিকা থাকিত। সেও শুকের মত তিন কালের খবর জানিত। একদিন রাজকন্যা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'শারিকে! যদি তিন কালের খবরই তোমার জানা থাকে তাহা হইলে বল ত কাহার সঙ্গে আমার বিবাহ হইবে?'

শারিকা বলিল—'রাজকুমারি; ভোগবতী নগরের রাজা অনঙ্গসেনের সহিত আপনার বিবাহ হইবে।'

কিছুদিনের মধ্যে ঘটক মগধে গিয়া অনঙ্গসেনের সহিত চন্দ্রাবতীর বিবাহের প্রস্তাব করিতেই রাজা তৎক্ষণাৎ তাহাতে সম্মত হইলেন। ঘটক এই খবর লইয়া তৎক্ষণাৎ মগধে ফিরিয়া গেল। তারপর নির্দিষ্ট দিনে দুইজনের বিবাহ হইল। রাজধানীতে ফিরিয়া অনঙ্গসেন চন্দ্রাবতীকে লইয়া পরম সুখে কাল কাটাইতে লাগিলেন।

স্বামিগৃহে আসিবার সময় চন্দ্রাবতী তাঁহার শারিকাটিকেও সঙ্গে আনিয়াছিলেন। একদিন রাজা-রাণী অন্তঃপুরে বসিয়া আছেন, শুক-শারিকাও তাঁহাদের সম্মুখে রহিয়াছে। তখন রাজা রাণীকে বলিলেন—'দেখ, একাকী থাকিলে বড় কষ্ট হয়। সেইজন্য আমার ইচ্ছা

শুক-শারির বিবাহ দিয়া একই খাঁচায় দুটিকে রাখিয়া দি।' রাণী একটু হাসিয়া সম্মতি দিলে, রাজা শুকের সঙ্গে শারির বিবাহ দিয়া দুইজনকে একই খাঁচায় রাখিয়া দিলেন।

দিন যায়। একদিন রাজা-রাণী অন্তঃপুরে আমোদ-প্রমোদ করিতেছেন, এমন সময় শুক-শারিকার মধ্যে ঝগড়া বাধিয়া গেল। শারিকা বলিতে লাগিল—'পুরুষজাতি অতিশয় স্বার্থপর, ধূর্ত ও অধর্মী। এজন্য তাহার সঙ্গে আমার বাস করিতে ইচ্ছা হয় না।'

শুকও বলিল—মেয়েরাও চঞ্চলা, মিথ্যাবাদিনী ও কুটিলা।'

রাজা তাহাদের ঝগড়া শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'হে শুক! হে শারিকে! তোমরা বৃথা ঝগড়া করিতেছ কেন?'

শারিকা বলিল—'মহারাজ! পুরুষজাতি বড় অধর্ম্মী; এইজন্য তাহাদের উপর আমার শ্রদ্ধা ও আকর্ষণ নাই। পুরুষের ব্যবহার ও চরিত্র সম্বন্ধে একটি গল্প বলিতেছি, শুনুন—

ইলাপুরে মহাধন নামে এক ধনশালী বণিক ছিলেন। অনেক দিন কাটিয়া গেল, তথাপি তাঁহার ছেলে হইল না, এজন্য তাঁহার মনে বড় দুঃখ ছিল। অবশেষে ভগবানের কৃপায় তাঁহার একটি ছেলে হইল। তিনি তাহার নাম রাখিলেন, নয়নানন্দ। নয়নানন্দ পাঁচ বৎসরের হইলে বণিক তাহার লেখা-পড়া শিখিবার জন্য উপযুক্ত শিক্ষকের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। কিন্তু ছেলেটি কুসংসর্গে মিশিয়া কুকাজে সময় নষ্ট করিতে লাগিল, পড়াশুনায় একটুও মন দিল না। শেষে বয়স বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার চরিত্র আরও মন্দ হইয়া উঠিল।

কিছুকাল পরে বণিক মারা গেলেন। নয়নানন্দ পাশা খেলিয়া, মদ খাইয়া, কুসংসর্গে বেড়াইয়া অল্পকালের মধ্যেই তাহার পিতার সমস্ত সম্পত্তি নষ্ট করিয়া ফেলিল। ফলে তাহার কষ্টের সীমা রহিল না। তখন সে ইলাপুর ছাড়িয়া নানা জায়গায় ঘুরিয়া চন্দ্রপুরের বণিক হেমগুপ্তের বাড়ী গিয়া উঠিল। হেমগুপ্ত তাহার পিতার পরম বন্ধু ছিলেন। তাঁহার কাছে আত্মপরিচয় দিলে তিনি বড়ই আনন্দিত হইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন—'বৎস! তুমি হঠাৎ কোথা হইতে

এখানে আসিলে ?'

নয়নানন্দ বলিল—'আমি জাহাজে চড়িয়া সিংহলে বাণিজ্য করিতে যাইতেছিলাম। পথে প্রবল ঝড়ে সবগুলি জাহাজ ডুবিয়া যায়। ভাগ্যবলে আমি একখানি কাঠ ধরিয়া প্রাণরক্ষা করি। আমার লোকজন কে কোথায় গিয়াছে জানি না। জিনিষপত্র সবই ডুবিয়া গিয়াছে। এই দীন অবস্থায় দেশে ফিরিতে ইচ্ছা হয় না, আর কোন উপায় না পাইয়া আপনার কাছে আসিয়াছি।'

নয়নানন্দের কথা শুনিয়া হেমগুপ্ত মনে মনে ভাবিলেন—'আমি বহুদিন ধরিয়া রত্নাবতীর জন্য পাত্র খুঁজিতেছি ; কিন্তু কোথায়ও তাহার বর পাইতেছি না। ভগবান দয়া করিয়া ইহাকে আনিয়া দিলেন। ইহার পিতা অনেক সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। ছেলেটির বংশও ভাল। এ হয়ত ইহার পিতার সদ্‌গুণগুলিও পাইয়াছে। অতএব শীঘ্র দিন ঠিক করিয়া ইহার সহিত রত্নাবতীর বিবাহ দি।' এইরূপ স্থির করিয়া তিনি তাঁহার স্ত্রীর কাছে গিয়া সকল কথা বলিলেন ও জিজ্ঞাসা করিলেন –'তোমার মত কি ?'

স্ত্রী বলিলেন—'ভগবানের ইচ্ছা না হইলে এরূপ ঘটে না। তুমি শীঘ্র দুইজনের বিবাহের ব্যবস্থা কর।'

তারপর শুভদিনে শুভলগ্নে নয়নানন্দের সঙ্গে রত্নাবতীর বিবাহ হইয়া গেল।

কিছুদিন যায়। দুইজনে পরমসুখে দিন কাটাইতেছে।

একদিন নয়নানন্দের মনে দুষ্টবুদ্ধির উদয় হইল। সে তাহার স্ত্রীকে বলিল—'দেখ, অনেক দিন আমি দেশছাড়া। সেখানকার সকলের জন্য মন কেমন করিতেছে। অতএব তোমার পিতামাতাকে রাজী করিয়া আমাকে বিদায় দাও। আর, ইচ্ছা হইলে তুমিও আমার সঙ্গে যাইতে পার।'

রত্নাবতী তাহার পিতামাতার কাছে গিয়া স্বামীর ইচ্ছা জানাইলে তাঁহারা সম্মত হইলেন। রত্নাবতীও স্বামীকে আসিয়া বলিল—'পিতা-মাতা রাজী হইয়াছেন। কিন্তু তুমি আমাকে ফেলিয়া যাইও না।

তোমাকে ছাড়িয়া আমি কিছুতেই থাকিতে পারিব না।'

তারপর বণিক নয়নানন্দকে অনেক জিনিষপত্র ও ধন-রত্ন দিয়া বিদায় দিলেন। রত্নাবতীকেও অনেক মূল্যবান্ গহনায় সাজাইয়া স্বামীর সঙ্গে পাঠাইলেন। নয়নানন্দ মহানন্দে স্বদেশে যাত্রা করিল।

চলিতে চলিতে দুইজনে এক গভীর বনে আসিয়া পড়িলে নয়নানন্দ স্ত্রীকে বলিল—'দেখ, এই বনে দস্যুর ভয় আছে। গহনা পরিয়া যাওয়া নিরাপদ নহে। তুমি গহনাগুলি খুলিয়া আমায় দাও; আমি কাপড়ে বাঁধিয়া রাখি। তারপর নগরের কাছে গিয়া আবার গহনাগুলি পরিও। আর, পাল্কীরও দরকার নাই। বেহারারা পাল্কী লইয়া ফিরিয়া যাউক। আমরা দুইজনে দরিদ্রের বেশে হাঁটিয়া যাইব। তাহা হইলে নিরাপদে যাইতে পারিব।'

রত্নাবতী তৎক্ষণাৎ গহনাগুলি খুলিয়া স্বামীর হাতে দিল এবং দাস-দাসী ও পাল্কী বেহারাদের বিদায় করিয়া সেই দুষ্টের সঙ্গে হাঁটিয়া চলিল। নয়নানন্দ রত্নাবতীকে লইয়া ক্রমে আরও গভীর বনে উপস্থিত হইল এবং তাহাকে এক কূপের মধ্যে ফেলিয়া দিয়া পলায়ন করিল। রত্নাবতী কূয়ার মধ্যে পড়িয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল। দৈবাৎ এক পথিক সেইদিক দিয়া যাইতে যাইতে রত্নাবতীর কান্নার শব্দ শুনিয়া বিস্মিত হইল এবং কান্নার শব্দ লক্ষ্য করিয়া চলিতে চলিতে সেই কূয়ার ধারে উপস্থিত হইল। কূয়ার ভিতরে তাকাইয়া দেখিল, একটি পরমা-সুন্দরী মেয়ে চীৎকার করিয়া কাঁদিতেছে। পথিক তৎক্ষণাৎ তাহাকে বহুকষ্টে উপরে তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল—'তুমি কে? কি জন্য এই ভয়ঙ্কর বনে একাকিনী আসিয়াছিলে? তোমার এমন দশা কেন হইল?'

সত্য ঘটনা প্রকাশ করিলে স্বামীর নিন্দা করা হইবে। স্বামীর নিন্দা করা অন্যায়, এইজন্য রত্নাবতী বলিল—'আমি চন্দ্রপুরের বণিক হেমগুপ্তের কন্যা। আমার নাম রত্নাবতী। আমি স্বামীর সঙ্গে শ্বশুর-বাড়ী যাইতেছিলাম। এখানে পৌঁছিবামাত্র কয়েকজন দস্যু আসিয়া প্রথমে আমার সমস্ত গহনা কাড়িয়া লইয়া আমাকে এই কূয়ার মধ্যে

ফেলিয়া দিল। তারপর আমার স্বামীকে নির্দয়ভাবে মারিতে মারিতে লইয়া গেল। তাঁহার কি দশা হইয়াছে জানি না।'

রত্নাবতীর কথা শুনিয়া পথিক খুব দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিল এবং তাহাকে অনেক সান্ত্বনা দিয়া পিতার বাড়ী পৌঁছাইয়া দিল।

রত্নাবতীর পিতামাতা তাহাকে বড় ভালবাসিতেন। তাঁহারা



গহনাগুলি খুলিয়া দিল···

কন্যাকে ঐরূপ দুর্দশাগ্রস্ত হইয়া ফিরিতে দেখিয়া বড়ই বিস্মিত ও দুঃখিত হইলেন এবং তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'বাছা! কি করিয়া তোমার এমন দশা হইল?'

রত্নাবতী পথিকের কাছে যাহা বলিয়াছিল, পিতামাতার কাছেও সেইরূপই বলিল।

হেমগুপ্ত বলিলেন—'বাছা ! আমার মনে ধারণা হইতেছে, তোমার স্বামী বাঁচিয়া আছেন। চোরেরা অর্থপিশাচ ; তাহারা টাকা পাইলে অকারণে প্রাণ নষ্ট করে না।'

এইসব বলিয়া তিনি কন্যাকে আশ্বাস দিয়া শীঘ্রই আর এক প্রস্থ গহনা গড়াইয়া দিলেন।

এদিকে নয়নানন্দ নিজের বাড়ীতে আসিয়া রত্নাবতীর গহনাগুলি বিক্রয় করিয়া এবং সেই টাকায় দিনরাত্রি মদ্যপান করিয়া, পাশা খেলিয়া, নানারকম আমোদ-প্রমোদে কাটাইতে লাগিল। ক্রমে টাকাগুলি শেষ হইয়া গেলে সে আগের মতই দীন দরিদ্র হইয়া পড়িল। তখন সে মনে মনে ভাবিল—'আমি রত্নাবতীর উপর যে ব্যবহার করিয়াছি, তাহা আমার শ্বশুর-বাড়ীর কেহ জানে না। অতএব একটা ছল করিয়া সেখানে উপস্থিত হইব এবং সেখানে দুই-চারদিন থাকিয়া এক সুযোগে আবার কিছু হস্তগত করিয়া চলিয়া আসিব।'

এই রকম মতলব করিয়া সে শ্বশুর-বাড়ী গেল এবং সেখানে রত্নাবতীই তাহাকে সকলের আগে দেখিতে পাইল।

রত্নাবতী স্বামীকে দেখিয়া ভাবিতে লাগিল—'স্বামী দোষ করিলেও গুরুজন। উনি ভুল করিয়াই আমার উপর ঐ রকম ব্যবহার করিয়াছিলেন। গুরুজনের দোষ ধরা অন্যায়। যাহা হউক, উনি হয়ত সকল ব্যাপার জানেন না ; আমাকে দেখিলেই পলায়ন করিবেন। অতএব আগে উহার ভয় ভাঙ্গিয়া দেওয়া উচিত।' এই ভাবিয়া রত্নাবতী স্বামীর সম্মুখে আসিয়া বলিল—'তোমার কোন ভয় নাই। আমি পিতামাতার কাছে বলিয়াছি যে, দস্যুরা আমার গহনাগুলি কাড়িয়া লইয়া আমাকে কুয়ার মধ্যে ফেলিয়া দেয়। তারপর তোমাকে বাঁধিয়া লইয়া গিয়াছে। এই সংবাদে তাঁহারা তোমার জন্য চিন্তিত আছেন। তোমায় জিজ্ঞাসা করিলে আমি তাঁহাদের কাছে যেমন বলিয়াছি,তুমিও সেইরূপ বলিও।'

এই বলিয়া রত্নাবতী চলিয়া গেলে ধূর্ত নয়নানন্দ তৎক্ষণাৎ শ্বশুরের কাছে গিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। বণিক তাহাকে আশীর্বাদ করিয়া

সমস্ত কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। রত্নাবতী তাহাকে যেমন বলিতে বলিয়াছিল, নয়নানন্দ শ্বশুরের কাছে তেমনি বলিল। তাহার কথা শুনিয়া ও ভাব দেখিয়া হেমগুপ্তের মনে খুবই দয়া জন্মিল।

তারপর রাত্রি আসিল। বহুদিন পরে স্বামীকে দেখিয়া রত্নাবতীর মনে বড় আনন্দ হইয়াছিল। সেইজন্য সে তাহার সমস্ত গহনা পরিয়া শয়নঘরে প্রবেশ করিল। কিছুক্ষণ কথাবার্তার পরে দুইজনে শয়ন করিলে, ধূর্ত নয়নানন্দ ঘুমের ভাণ করিয়া নাক ডাকাইতে লাগিল। রত্নাবতী দেখিল, স্বামী অঘোরে ঘুমাইতেছেন। সেও শীঘ্রই ঘুমাইয়া পড়িল। তখন সেই পাপিষ্ঠ নয়নানন্দ সুযোগ বুঝিয়া কোমর হইতে ছুরি বাহির করিল এবং তাহা দিয়া সেই নিরুপম স্ত্রী-রত্নের কণ্ঠনালী কাটিয়া সমস্ত গহনা লইয়া পলায়ন করিল।'

গল্প শেষ করিয়া শারিকা বলিল—'মহারাজ! ইহা আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি। সেই থেকে পুরুষজাতির উপর আমার ঘৃণা ও অবিশ্বাস জন্মিয়াছে। প্রতিজ্ঞা করিয়াছি পুরুষের মুখও দেখিব না।'

শারিকার কথা শুনিয়া, রাজা ঈষৎ হাস্য করিয়া শুককে বলিলেন—'ওহে চূড়ামণি, তুমি কি জন্য স্ত্রীজাতির উপর এত বিরক্ত? সব কথা বর্ণনা কর।'

তখন শুক বলিল—'মহারাজ, শুনুন'—

কাঞ্চনপুর নগরে সাগর দত্ত নামে এক শ্রেষ্ঠী ছিলেন। তাঁহার একটি পুত্র ছিল; তাহার নাম শ্রীদত্ত। শ্রীদত্ত বড় সুশীল ও শান্ত ছিল। অনঙ্গপুর-নিবাসী সোমদত্ত শ্রেষ্ঠীর কন্যা জয়শ্রীর সঙ্গে তাহার বিবাহ হয়। কিছুদিন পরে শ্রীদত্ত বাণিজ্য করিতে দেশান্তরে গেলে, জয়শ্রী তাহার পিতার বাড়ীতে বাস করিতে লাগিল। তারপর অনেক দিন চলিয়া গেল, শ্রীদত্ত তবুও ফিরিল না।

জয়শ্রী কিন্তু অত্যন্ত চঞ্চলা ও দুষ্টপ্রকৃতির ছিল। সে নানা রকম কুকার্য করিয়া দিন কাটাইত। স্বামীর প্রতি তাহার কোনই টান ছিল না।

এদিকে অনেক দিন পরে শ্রীদত্ত বাণিজ্য হইতে বাড়ী ফিরিয়া

শ্বশুর-বাড়ী গেল। একে জামাই, তাহার উপর অনেকদিন পরে আসিয়াছে, সেজন্য সোমদত্ত জামাইয়ের জন্য খুব আমোদ-আহ্লাদের আয়োজন করিলেন। সারাদিন আমোদ-উৎসবে কাটাইয়া শ্রীদত্ত রাত্রে আহারাদির পর শয়ন করিতে গেল। কিন্তু জয়শ্রী কিছুতেই স্বামীর কাছে যাইতে চাহিল না। তাহার মা তাহাকে অনেক বুঝাইলেন, জয়শ্রী তথাপি অটল। শেষে তিনি জোর করিয়া তাহাকে জামাইয়ের ঘরে দিয়া আসিলেন। জয়শ্রী স্বামীর ঘরে গেল বটে, কিন্তু তাহার সঙ্গে একটিও কথা বলিল না ; তাহার দিকে পিছন ফিরিয়া শুইয়া রহিল। শ্রীদত্ত স্ত্রীকে অনেক মিষ্ট কথা কলিয়া সন্তুষ্ট করিতে চেষ্টা করিল। তথাপি জয়শ্রীর মন গলিল না ; সে তেমনি পিছন ফিরিয়া শুইয়া রহিল। শ্রীদত্ত জয়শ্রীর জন্য নানা রকম মূল্যবান গহনা ও কাপড়-চোপড় আনিয়াছিল। জয়শ্রীকে আদর করিয়া দিতে গেলে জয়শ্রী রাগ করিয়া সেগুলি ছুঁড়িয়া ফেলিল। শ্রীদত্ত যখন দেখিল, জয়শ্রী কিছুতেই তাহার উপর সন্তুষ্ট হইতেছে না, তখন সে ঘুমাইয়া পড়িল।

স্বামীকে অঘোরে ঘুমাইতে দেখিয়া, জয়শ্রী বিছানা হইতে উঠিল। তারপর শ্রীদত্ত যে সকল গহনা এবং কাপড় আনিয়াছিল, সেগুলি পরিয়া পথে বাহির হইল। সে ভাবিল, তাহার প্রিয় সখীর বাড়ী গিয়া সখীর কাছে মনের দুঃখ জানাইবে। এই ভাবিয়া সে পথ দিয়া চলিতেছে। তখন এক চোর ঐ পথে দাঁড়াইয়াছিল। সে জয়শ্রীকে যাইতে দেখিয়া মনে মনে ভাবিল—'এই মেয়েটি এমন সাজিয়া-গুজিয়া এত রাত্রে একাকিনী কোথায় যাইতেছে, দেখিতে হইবে।' এই ভাবিয়া সে জয়শ্রীর পিছন পিছন চলিতে লাগিল।

এদিকে জয়শ্রীর প্রিয় সখী যে ঘরে ঘুমাইত সে ঘরে তাহাদের একজন পরিচিত লোক ঘুমাইতেছিল। হঠাৎ একটা সাপ আসিয়া তাহাকে কামড়াইয়া মারিয়া ফেলিল। তারপরই জয়শ্রী সেই ঘরে আসিয়া মনে করিল, বিছানায় বুঝি তাহার প্রিয় সখী ঘুমাইতেছে। সে তাহার পাশে শুইয়া আদর করিয়া তাহাকে ডাকিতে লাগিল।

চোরও দূরে দাঁড়াইয়া কৌতুক দেখিতেছে। সেই ঘরের কাছে একটা গাছে বসিয়া একটা পিশাচও কৌতুক দেখিতেছিল। সে জয়শ্রীর উপর ভয়ঙ্কর রাগিয়া গেল। মনে মনে বলিল, 'শ্রীদত্তের মত স্বামীর উপর যে স্ত্রী দুর্ব্যবহার করিতে পারে, এমন রাত্রে ঘর ছাড়িয়া দুষ্ট স্ত্রীলোকের মত যে বাহির হইতে পারে, তাহাকে শাস্তি দেওয়া উচিত।' এই ভাবিয়া সে ঐ মৃত লোকটির দেহে প্রবেশ করিল এবং দাঁত দিয়া জয়শ্রীর নাক কাটিয়া লইল। তখন জয়শ্রীর চৈতন্যোদয় হইল। সে বুঝিতে পারিল, এতক্ষণ যাহার সহিত কথা বলিতে চেষ্টা করিতেছিল, সে তাহার সখী নহে, একটি মৃতদেহ।

এই সময়ে তাহার প্রিয় সখীও সেখানে আসিয়া উপস্থিত। জয়শ্রী কপালে আঘাত করিতে করিতে তাহার সখীর কাছে কাঁদিতে লাগিল; বলল—'ভাই! আমি কি করিয়া এখন বাড়ীতে মুখ দেখাইব? আমার বাবা-মা কি বলিবেন? এতদিন পরে আমার সেই স্বামীটাও আসিয়াছে। তাহার কাছ হইতে তোমার বাড়ীতে পলাইয়া আসিয়া আমার এমন দশা হইল। আমি বিষ খাইয়া আত্মহত্যা করিব।'

এই বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে হঠাৎ তাহার মাথায় এক দুষ্ট বুদ্ধি জোগাইল। সে সখীকে বলিল—'আমি এই অবস্থায় বাড়ী গিয়া শুইবার ঘরের মধ্য হইতে চীৎকার করিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করি। আমার কান্নার শব্দে সকলে জাগিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিতে আসিলে বলিব,—আমার স্বামী ভয়ঙ্কর রাগিয়া আমাকে মারিতে মারিতে আমার নাক কাটিয়া দিয়াছেন।'

জয়শ্রীর কথা শুনিয়া তাহার সখী বলিল—'তুমি ঠিক উপায় বাহির করিয়াছ।'

জয়শ্রী তৎক্ষণাৎ বাড়ী গিয়া শয়নঘর হইতে চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল। জয়শ্রীর কান্না শুনিয়া বাড়ীর সকলে তাহার শয়ন-ঘরে গিয়া দেখিল, তাহার নাক নাই। রক্তে তাহার সমস্ত কাপড়-চোপড় ভিজিয়া গিয়াছে ও সে মাটিতে পড়িয়া কাঁদিতেছে। সকলে ব্যস্ত হইয়া তাহার এমন দুর্দশার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে জয়শ্রী তাহার

স্বামীর দিকে আঙ্গুল বাড়াইয়া বলিল—'ঐ শয়তান আমার এমন দশা করিয়াছে।'

তখন সকলে মিলিয়া শ্রীদত্তকে গালাগালি করিতে লাগিল।

শান্ত সুশীল শ্রীদত্ত ব্যাপারটি কিছুই জানে না। হঠাৎ এমন ভয়ঙ্কর কাণ্ড দেখিয়া ও সকলের গালাগালি শুনিয়া সে বিস্মিত হইল এবং মনে মনে ভাবিতে লাগিল, 'জয়শ্রীর স্বভাব-চরিত্রের বিষয় না জানিয়া শ্বশুর-বাড়িতে আসা আমার উচিত হয় নাই। জানি না, শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটি কি রকম দাঁড়াইবে।'

পরদিন সকাল হইবামাত্র জয়শ্রীর পিতা সোমদত্ত রাজার কাছে নালিশ করিলে, কোতোয়াল আসিয়া শ্রীদত্তকে বিচারালয়ে লইয়া গেল। বিচারক জয়শ্রী ও সোমদত্তকে সামনাসামনি দাঁড় করাইয়া জয়শ্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'কে তোমার এই দুর্দশা করিয়াছে?'

জয়শ্রী তাহার স্বামীর দিকে তাকাইয়া বলিল—'ধর্মাবতার! উনি আমার স্বামী। উনিই আমার এরূপ দুর্দশা করিয়াছেন।'

বিচারক শ্রীদত্তকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'কি জন্য তুমি এমন দুষ্কর্ম করিলে?'

শ্রীদত্ত বলিল—'ধর্মাবতার! আমি এ বিষয়ের ভাল-মন্দ কিছুই জানি না। আপনার বিচারে যাহা হয় তাহার ব্যবস্থা করুন।' এই বলিয়া, শ্রীদত্ত বিষণ্ণমুখে দাঁড়াইয়া রহিল।

বিচারক বাদী ও প্রতিবাদীর কথা শুনিয়া, প্রতিবাদী অর্থাৎ শ্রীদত্তকে শূলে চড়াইবার আদেশ দিলেন।

চোর এতক্ষণ দূরে দাঁড়াইয়া সমস্ত ব্যাপার দেখিতেছিল। সে এবার বিচারকের সম্মুখে আসিয়া বলিল—'ধর্মাবতার। আপনি একজন নির্দোষের প্রাণদণ্ড দিতেছেন।'

চোরের কথা শুনিয়া বিচারক ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। চোর তাঁহার কাছে একে একে সব কথা বলিলে, 'বিচারক ব্যাপারটি এবার বেশ ভাল করিয়া অনুসন্ধান করিলেন। সেই মৃত লোকটার মুখের ভিতর হইতে নাকের কাটা অংশটুকু আনা হইল। তাহা দেখিয়া বিচারক

চমৎকৃত হইলেন। তিনি শ্রীদত্তকে নিরপরাধ স্থির করিয়া তাহাকে ও চোরকে পুরস্কার দিয়া বিদায় দিলেন। আর জয়শ্রীর মাথা মুড়াইয়া ঘোল ঢালিয়া তাহাকে গাধায় চড়াইয়া সারা নগরে ঘুরাইলেন। তারপর তাহাকে দেশ হইতে তাড়াইয়া দিলেন।'

চূড়ামণি তাহার গল্প শেষ করিয়া বলিল—'মহারাজ! মেয়েদের এত গুণ!'

গল্প শেষ হইলে, বেতাল জিজ্ঞাসা করিল—"মহারাজ! জয়শ্রী ও নয়নানন্দের মধ্যে সবচেয়ে বেশী দুষ্ট কে?"

রাজা বলিলেন—"আমার মতে দুই-ই সমান।"

ইহা শুনিয়া বেতাল ইত্যাদি—

পঞ্চম গল্প

বেতাল বলিল—"মহারাজ! ধারানগরে মহাবল নামে একজন শক্তিশালী রাজা ছিলেন। তাঁহার দূতের নাম ছিল হরিদাস। ঐ দূতের একটি কন্যা ছিল; তাহার নাম মহাদেবী। মহাদেবী খুব সুন্দরী ও গুণবতী ছিল। তাহার বিবাহের বয়স হইলে বাড়ীতে সে সম্বন্ধে মধ্যে মধ্যে আলোচনা হইত। একদিন মহাদেবী তাহার পিতাকে বলিল—'বাবা! এমন লোকের সঙ্গে আমার বিবাহ দিবেন, যেন তিনি সকল বিষয়ে গুণবান হন।' কন্যার কথা শুনিয়া হরিদাস খুব সন্তুষ্ট হইয়া চারিধারে সেইরূপ পাত্র খুঁজিতে লাগিলেন।

এমন সময় রাজা একদিন দূতকে বলিলেন—'হরিদাস! দক্ষিণ দেশে হরিশ্চন্দ্র নামে এক রাজা আছেন। তিনি আমার পরম বন্ধু। অনেকদিন তাঁহার কোন সংবাদ না পাইয়া বড়ই চিন্তিত আছি। তুমি গিয়ে তাঁহার সংবাদ লইয়া আইস।'

হরিদাস রাজাজ্ঞায় দক্ষিণ দেশে যাত্রা করিলেন এবং রাজা হরিশ্চন্দ্রের রাজধানীতে পৌঁছিয়া তাঁহার কাছে রাজা মহাবলের সংবাদ পাঠাইলেন। বন্ধুর সংবাদ পাইয়া রাজা হরিশ্চন্দ্র খুব সন্তুষ্ট

হইলেন ; হরিদাসকে যথেষ্ট পারিতোষিক দিয়া তাঁহাকে রাজধানীতে কিছুকাল বাস করিতে অনুরোধ করিলেন। হরিদাস রাজার অনুরোধে সেখানে বাস করিতে লাগিলেন।

একদিন হরিদাস রাজসভা হইতে ফিরিয়া দেখিলেন, তাঁহার আবাসে একটি ব্রাহ্মণের ছেলে তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। তিনি ব্রাহ্মণের ছেলেটিকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'তুমি কে? কি জন্য আসিয়াছ?'

ছেলেটি বলিল—'আপনার এক পরমাসুন্দরী গুণবতী কন্যা আছে। আমার সঙ্গে তাহার বিবাহ দিন।'

হরিদাস বলিলেন—'আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে সকল বিষয়ে নিপুণ হইবে, তাহার সঙ্গেই আমার মেয়ের বিবাহ দিব।'

ছেলেটি বলিল—'বাল্যকাল হইতে আমি নানা বিদ্যায় নিপুণ হইয়াছি। আমি এক অদ্ভুত রথ তৈয়ারী করিয়াছি। তাহাতে চড়িয়া এক বৎসরের পথ এক দণ্ডে পার হওয়া যায়।'

শুনিয়া হরিদাস সন্তুষ্ট হইলেন ; বলিলেন—'তোমার সঙ্গেই আমার মেয়ের বিবাহ দিব। কাল তুমি রথ লইয়া আসিও।'

পরদিন সকাল হইলেই ছেলেটি রথ লইয়া আসিল। হরিদাস রাজার কাছ হইতে বিদায় লইয়া আগে হইতেই যাইবার জন্য প্রস্তুত ছিলেন। দুইজন রথে চড়িয়া নিমেষে ধারানগরে আসিয়া পৌঁছিলেন।

হরিদাস যখন দক্ষিণ দেশে ছিলেন, সেই সময়ে তাঁহার স্ত্রী ও পুত্র দুইজনে দুটি ব্রাহ্মণের ছেলেকে বাছিয়া তাহাদের সঙ্গে মহাদেবীর বিবাহ দিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন। কেবল হরিদাস ছিলেন না বলিয়াই বিবাহ হয় নাই। হরিদাস বাড়ী আসিলে সেই বর দুই-জনও আসিয়া উপস্থিত হইল।

মহাদেবীর জন্য তিন বর উপস্থিত দেখিয়া হরিদাস বড় চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। তিনজনেই রূপবান ও গুণবান। ইহাদের মধ্যে কাহার হাতে মহাদেবীকে দান করিবেন? তিনি তাহাদের তিনজনকে বলিলেন—'তোমরা আজ আমার বাড়ীতে থাক। আমি আমার স্ত্রী-

পুত্রের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া সব ঠিক করিব।'

বরেরা হরিদাসের অনুরোধে সেদিন তাঁহার বাড়ীতে থাকিল। দুর্ভাগ্যবশতঃ সেই রাত্রিতে বিন্ধ্যাচলবাসী এক রাক্ষস আসিয়া মহাদেবীকে ধরিয়া লইয়া গেল।

সকালে ঘুম হইতে উঠিয়া সকলে দেখে, মহাদেবী নাই। সকলে মহাব্যস্ত হইয়া উঠিল। চারিধারে তাঁহার খোঁজ করিল; কিন্তু তাহাকে পাওয়া গেল না।

বরদিগের মধ্যে একজন সমাধিবলে ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান স্পষ্ট দেখিতে পাইত। সে হরিদাসকে বলিল—'মহাশয়! ভাবিবেন না।



তোমরা আজ আমার বাড়িতে থাক···

আমি দেখিতেছি এক রাক্ষস আপনার মেয়েকে ধরিয়া লইয়া গিয়া বিন্ধ্যপর্বতে লুকাইয়া রাখিয়াছে।'

দ্বিতীয় বর বলিল—'আমি শব্দভেদী বাণ দিয়া শত্রুকে বধ করিতে পারি। কোন রকমে সেখানে যাইতে পারিলে রাক্ষসের প্রাণবধ করিব।'

তৃতীয় বর বলিল—'আমার এই রথে চড়িয়া শীঘ্র সেখানে যান।'

তখন তৃতীয় বরের রথে চড়িয়া সকলে বিন্ধ্যপর্বতে গেল এবং শব্দ-ভেদী বাণ দিয়া রাক্ষসকে বধ করিয়া মহাদেবীকে উদ্ধার করিয়া ধারা-

নগরে ফিরিয়া আসিল। কিন্তু তাহার পর তিন বরের মধ্যে ঝগড়া বাধিয়া গেল। তিনজনেই মহাদেবীকে বিবাহ করিবার দাবী জানাইতে লাগিল। তিনজনেই বলে,—'আমিই উহাকে উদ্ধার করিয়াছি।' ইহা দেখিয়া হরিদাস হতভম্ব হইয়া গেল।"

গল্প শেষ করিয়া বেতাল জিজ্ঞাসা করিল—"মহারাজ! তিনজনের মধ্যে মহাদেবীকে বিবাহ করিবার অধিকারী কে?"

রাজা বলিলেন—"যে রাক্ষসের প্রাণবধ করিয়াছে।"

বেতাল বলিল—"কেন? তিনজনেই সমান বিদ্বান। তিনজনেই মহাদেবীকে উদ্ধার করিবার সাহায্য করিয়াছে। তবে ঐ লোকটি কেন মহাদেবীকে বিবাহ করিবে?"

রাজা বলিলেন—"তোমার কথা ঠিক বটে, কিন্তু সূক্ষ্ম বিচার করিলে দেখা যাইবে, যে রাক্ষসকে মারিয়াছে আসল কাজটি করিয়াছে সে।"

ইহা শুনিয়া বেতাল ইত্যাদি—

ষষ্ঠ গল্প

বেতাল বলিল—"মহারাজ! ষষ্ঠ গল্প শুনুন—

ধর্মপুর নগরে এক রাজা ছিলেন; তাঁহার নাম ছিল ধর্মশীল। রাজা বড় গুণবান ও ধার্মিক ছিলেন। তাঁহার মন্ত্রীর নাম অন্ধক। রাজা মন্ত্রীর পরামর্শে কাত্যায়নী দেবীর মন্দির তৈয়ারী করিয়া প্রত্যহ ভক্তিভরে দেবীর পূজা করিতে লাগিলেন। কিন্তু রাজার মনে যে এক দুঃখ ছিল, তাহা দূর হইল না—তিনি পুত্রের মুখদেখিতে পাইলেন না।

একদিন মন্ত্রীর পরামর্শানুসারে তিনি দেবীর সম্মুখে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া ভক্তি গদ্‌গদকণ্ঠে জোড়হাতে দেবীর নানা স্তব করিতে লাগিলেন—'মা! তুমি ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়া থাক। আমি তোমার শরণাপন্ন হইয়াছি। আমার মনস্কামনা পূর্ণ কর—।' এই

ভাবে স্তব শেষ করিয়া,রাজা সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া জোড়হাতে দেবীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

তখন দৈববাণী হইল—'রাজন্! আমি তোমার উপর প্রসন্ন হইয়াছি। তোমার যাহা ইচ্ছা বর প্রার্থনা কর।'

রাজা বলিলেন—'দেবী! যদি প্রসন্ন হইয়া থাক, তাহা হইলে আমায় এই বর দাও যেন আমি শীঘ্রই পুত্রের মুখ দেখি।' দেবী বলিলেন—'তথাস্তু! শীঘ্রই তোমার একটি শান্ত, সুশীল ও গুণবান পুত্র হইবে।'

দেবীর বরে শীঘ্রই রাজার একটি পুত্র জন্মিল। রাজা মহাসমারোহে দেবীর পূজা করিলেন। নগরে আনন্দোৎসব আরম্ভ হইল।

একদিন দীনদাস নামে এক তন্তুবায় কোন কার্য্যের জন্য তাহার বন্ধুর সঙ্গে রাজধানীতে যাইতেছিল। সেখানে তাহার স্ব-জাতীয়া একটি সুন্দরী মেয়েকে দেখিয়া মনে মনে তাহার রূপের খুব প্রশংসা করিল এবং প্রতিজ্ঞা করিল,—মেয়েটিকে বিবাহ করিবই। দেবী কাত্যায়নীর দয়ায় আমাদের রাজা বৃদ্ধবয়সে পুত্রের মুখ দেখিয়াছেন। দেবীর দয়া হইলে, আমিও ঐ মেয়েটিকে বিবাহ করিতে পারিব।

এই ভাবিয়া সে কাত্যায়নী দেবীর মন্দিরে গিয়া খুব ভক্তির সঙ্গে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া জোড়হাতে বলিতে লাগিল—'মা! যদি ঐ মেয়েটির সঙ্গে আমার বিবাহ হয়, তাহা হইলে, নিজের হাতে আমার মাথা কাটিয়া তোমার পূজা দিব।' এইরূপ মানসিক করিয়া সে দেবীকে প্রণাম করিয়া বন্ধুর সঙ্গে বাড়ীতে ফিরিয়া আসিল।

কিছুদিন যায়। ঐ মেয়েটির জন্য দীনদাস বড় দুঃখে দিন কাটায়। তাহার মনে স্ফূর্তি নাই ; কোন কাজেও উৎসাহ দেখা যায় না। তাহার বন্ধু দীনদাসের এই অবস্থা দেখিয়া অবশেষে তাহার পিতার কাছে ব্যাপারটি জানাইল। পিতা চিন্তিত হইলেন ; ভাবিলেন—'কন্যাটির পিতার কাছে বিবাহের প্রস্তাব করিয়া দেখা যাক্। দীনদাসের যেরূপ অবস্থা দেখিতেছি, তাহাতে মেয়েটির সহিত উহার বিবাহ হওয়া একান্ত আবশ্যক।'

তারপর দীনদাসকে সঙ্গে লইয়া তিনি কন্যার পিতার বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। কিছুক্ষণ আলাপ-পরিচয়ের পর তিনি দীনদাসের সঙ্গে তাঁহার মেয়ের বিবাহের প্রস্তাব করিলেন। কন্যার পিতা দীনদাসের পিতার প্রস্তাবে তৎক্ষণাৎ সম্মত হইলেন। ইহার পর শীঘ্রই ঐ কন্যাটির সঙ্গে দীনদাসের বিবাহ হইয়া গেল। দুই জনে মহাসুখে দিন কাটাইতে লাগিল।

কিছুদিন পরে শ্বশুর-বাড়ীতে কোন কার্য্য উপলক্ষে দীনদাসের নিমন্ত্রণ হইল। সে তাহার স্ত্রী ও বন্ধুর সঙ্গে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে চলিল। রাজধানীর কাছে পৌঁছিয়া সে দেখিল নিকটেই কাত্যায়নী দেবীর মন্দির রহিয়াছে। তখন তাহার মানসিকের কথা মনে পড়িল। সে নিজেকে ধিক্কার দিয়া ভাবিল—'আমি নিতান্ত মিথ্যাবাদী ও পাপিষ্ঠ। দেবীর কাছে মানসিক করিয়া তাহা আজও পূরণ করিলাম না। জন্ম-জন্মান্তরেও আমার উদ্ধার নাই। যাহা হউক, এখনই তাঁহার পূজা করিয়া ধার পরিশোধ করিব।'

ইহা স্থির করিয়া সে তাহার বন্ধুকে বলিল—'বন্ধু! তুমি এইখানে কিছুক্ষণ অপেক্ষা কর। আমি দেবী দর্শন করিয়া ফিরিয়া আসিতেছি।' এই বলিয়া সে মন্দিরে পৌঁছিল ও তাহার পাশের পুষ্করিণীতে স্নান করিয়া বিধিমত দেবীর পূজা করিল। তারপর দেবীকে সম্বোধন করিয়া বলিল—'মা! অনেককাল আগে তোমার কাছে মানসিক করিয়াছিলাম। আজ তাহা পরিশোধ করিতেছি।' বলিয়াই মন্দিরের খড়্গ দিয়া নিজের মাথা কাটিয়া ফেলিল।

এদিকে দীনদাসের আসিতে দেরী দেখিয়া বন্ধু দীনদাসের স্ত্রীকে বলিল—'তুমি এইখানে থাক; আমি বন্ধুকে ডাকিয়া আনি—।' এই বলিয়া সে মন্দিরে গিয়া দেখিল, তাহার বন্ধুর মাথা এক জায়গায় ও দেহ আর এক জায়গায় পড়িয়া আছে! বন্ধুর এমন দশা দেখিয়া তাহার মনে ভয় হইল। সে ভাবিল—'লোকে মনে করিবে আমিই ইহাকে কাটিয়া ফেলিয়াছি। কেহই বিশ্বাস করিবে না যে, এ আত্মহত্যা করিয়াছে। অকারণে দোষী হওয়া অপেক্ষা মরাই ভাল—' এই ভাবিয়া

সে-ও খড়্গ দিয়া নিজের মাথা কাটিয়া ফেলিল।

দীনদাসের স্ত্রী আর একাকিনী সেখানে দাঁড়াইয়া না থাকিয়া, তাহার স্বামী ও বন্ধুকে খুঁজিতে মন্দিরে গেল ; সেখানে গিয়া দেখিল, তাহার স্বামী ও বন্ধু মরিয়া মাটিতে পড়িয়া আছেন। ইহা দেখিয়া সে ভাবিল—'বোধ হয় পূর্বজন্মে আমি অনেক পাপ করিয়াছিলাম,তাই এই জন্মে আমার কপালে এইরূপ ঘটিল। সারা জীবন বিধবা হইয়া থাকার চেয়ে আমার মৃত্যুই ভাল—' এই ভাবিয়া, সে খড়্গ দিয়া নিজের মাথা কাটিবার উপক্রম করিতেই দেবী তৎক্ষণাৎ আবির্ভূতা হইয়া তাহার হাত ধরিলেন ও বলিলেন—'বৎসে! আমি তোমার সাহস ও সদ্বিবেচনা দেখিয়া সন্তুষ্ট। তুমি বর প্রার্থনা কর—'

দীনদাসের স্ত্রী বলিল—'মা! যদি প্রসন্ন হইয়া থাক, তবে ইঁহাদের দুইজনকে বাঁচাইয়া দাও—'

দেবী বলিলেন—'তথাস্তু। তুমি ইহাদের মাথা ও দেহ এক করিলেই ইহারা বাঁচিয়া উঠিবে'—বলিয়াই দেবী অদৃশ্য হইলেন।

দীনদাসের স্ত্রী দেবীর কথায় আনন্দে আত্মহারা হইয়া গেল। অন্ধের মত দীনদাসের মাথা তাহার বন্ধুর শরীরে,বন্ধুর মাথা দীনদাসের শরীরে লাগাইতেই তাহারা তৎক্ষণাৎ বাঁচিয়া উঠিল।"

গল্প শেষ করিয়া বেতাল জিজ্ঞাসা করিল—"এখন ঐ দুইজনের মধ্যে কে ঐ মেয়েটির স্বামী হইবে ?"

রাজা বলিলেন—"যে ব্যক্তির শরীরে দীনদাসের মাথা আছে। কেননা মাথাকেই উত্তমাঙ্গ বলা হয়।"

ইহা শুনিয়া বেতাল ইত্যাদি—

সপ্তম গল্প

বেতাল বলিল—"মহারাজ! চম্পানগরে চন্দ্রাপীড় নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার রাণীর নাম ছিল সুলোচনা ও কন্যার নাম ত্রিভুবনসুন্দরী। মেয়েটি বড় হইলে রাজা তাহার বিবাহের জন্য বড়ই চিন্তিত হইলেন। তাহার উপযুক্ত পাত্র কোথায় পাওয়া যায়? অন্য দেশের রাজারাও শুনিলেন—রাজা চন্দ্রাপীড়ের এক সুন্দরী কন্যা আছে, রাজা তাহার বিবাহের চেষ্টা করিতেছেন। তখন সকলে কন্যাটিকে বিবাহ করিবার জন্য নিজের নিজের মূর্তির ছবি আঁকিয়া চন্দ্রাপীড়ের কাছে পাঠাইতে লাগিলেন। চন্দ্রাপীড় আবার তাহাদের মধ্য হইতে বর পছন্দ করিবার জন্য ছবিগুলি কন্যার কাছে পাঠাইলেন। কিন্তু কন্যা কাহাকেও পছন্দ করিল না। সে বলিল—'যে বিদ্যা, বুদ্ধি ও বিক্রমে শ্রেষ্ঠ হইবে, আমি তাহাকেই বিবাহ করিব।'

কিছুদিন পরে বিদেশ হইতে রাজবাড়ীতে চারিজন বর উপস্থিত হইল। তাহারা রাজার কাছে নিজের নিজের গুণের পরিচয় দিতে লাগিল।

প্রথম জন বলিল—'আমি বাল্যকাল হইতে নানা বিদ্যা শিখিয়াছি। আমার এক অসাধারণ গুণ এই যে,আমি প্রত্যহ একখানি করিয়া সুন্দর বস্ত্র বুনিতে পারি; তাহার দাম পাঁচ রত্ন। আমার রূপের পরিচয় দিবার দরকার নাই,মহারাজ তাহা স্বচক্ষে দেখিতেছেন।'

দ্বিতীয় জন বলিল—'আমি জলচর, স্থলচর সমস্ত পক্ষীর ভাষা জানি। আমি অদ্বিতীয় বলবান। আমার আকৃতি মহারাজ স্বচক্ষে দেখিতেছেন।'

তৃতীয় জন বলিল—'আমারও রূপ মহারাজ দেখিতেছেন। গুণের বিষয় এইটুকু বলিব, আমি শাস্ত্রে অদ্বিতীয়।'

তখন চতুর্থ জন বলিল—'মহারাজ! আমার রূপের পরিচয় দেওয়া

অনাবশ্যক। মহারাজ আমাকে স্বচক্ষে দেখিতেছেন। শস্ত্রবিদ্যায় আমার সমান কেহ নাই। আমি শব্দভেদী বাণ ছুঁড়িতে পারি।'

চারিজনের গুণের ও রূপের পরিচয় পাইয়া রাজা চন্দ্রাপীড় কিছুতেই স্থির করিতে পারিলেন না কাহাকে কন্যা দিবেন। চারিজনই ত রূপে, গুণে অসাধারণ। তখন তিনি কন্যাকে বলিলেন—'বৎসে! তুমি এই চারিজনের মধ্যে একজনকে বর পছন্দ কর।' পিতার কথা শুনিয়া ত্রিভুবনসুন্দরী লজ্জায় মাথা নত করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।"

ইহা বলিয়া বেতাল জিজ্ঞাসা করিল—"মহারাজ! উহাদের মধ্যে কে ত্রিভুবনসুন্দরীর স্বামী হইবার উপযুক্ত?"

রাজা বলিলেন—"যে বস্ত্র বুনিয়া বিক্রয় করে, সে শূদ্র; যে পক্ষীর ভাষা জানে, সে বৈশ্য; যে সকল শাস্ত্রে পণ্ডিত সে ব্রাহ্মণ, কিন্তু যে শস্ত্রবিদ্যায় অসাধারণ সে ব্যক্তি ক্ষত্রিয়—কন্যার স্বজাতীয়। অতএব শাস্ত্র ও যুক্তি অনুসারে সে-ই কন্যার পতি হইবার যোগ্য।"

ইহা শুনিয়া বেতাল ইত্যাদি—

অষ্টম গল্প

বেতাল বলিল—"মহারাজ! মিথিলা নগরে গুণাধিপ নামে এক রাজা ছিলেন। চিরঞ্জীব নামে দক্ষিণদেশবাসী এক রাজপুত রাজার গুণ ও দয়ার কথা শুনিয়া তাঁহার কাছে চাকরীর জন্য আসিল। কিন্তু অদৃষ্টক্রমে রাজা তখন রাজকার্য্য ছাড়িয়া, রাত্রিদিন কেবল অন্তঃপুরে মহিলাদের সঙ্গে সময় কাটাইতেছিলেন। এই ভাবে এক বৎসর চলিয়া গেল, রাজা তবুও সভায় আসিলেন না। চিরঞ্জীব খরচের জন্য যে টাকা সঙ্গে আনিয়াছিল, তাহা ফুরাইয়া গেল।

এইভাবে নিঃসম্বল হইয়া চিরঞ্জীব মনে মনে ভাবিল—'যে ব্যক্তি এক বৎসরেও রাজসভায় আসে না, রাজকার্য্যও দেখে না, তাহার কাছে চাকরীর প্রার্থনা করিলে তাহা পূরণ হইবার সম্ভাবনা অল্প। আর শীঘ্রই যে এ ব্যক্তির দেখা পাইব, তাহারও ঠিক নাই। এদিকে আমি

নিঃসম্বল হইয়া পড়িলাম। এখন আমার পক্ষে জীবনধারণের একমাত্র উপায় ভিক্ষা করা ; কিন্তু ভিক্ষা করা অপেক্ষা মৃত্যু ভাল। এতদিন আমি বৃথা আশায় কাটাইলাম। যে আশাকে জয় করিয়াছে, সে যথার্থ সুখী। অতএব আমি সংসার ছাড়িয়া বনে গিয়া তপস্যা করিব।— 'এই ভাবিয়া সে তপস্যা করিবার জন্য বনে চলিয়া গেল।

কিছুদিন পরে রাজা গুণাধিপ আবার রাজকার্য্যে মন দিলেন। নিয়মিত রাজসভা বসিতে লাগিল। তারপর একদিন রাজা সৈন্য-সামন্ত লইয়া বনে মৃগয়া করিতে গেলেন। বনে বনে ঘুরিয়া অবশেষে



রাজাকে সুমিষ্ট বনফল ও শীতল জল দিল

ঘোড়ায় চড়িয়া এক মৃগের পিছনে ছুটিতে ছুটিতে তিনি একাকী গভীর বনে আসিয়া পড়িলেন।

চারিধারে গভীর বন। রাজার মনে বড় ভয় হইল। ইহার উপর তিনি আবার ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর। চারিধারে জলের অন্বেষণ করিতে করিতে তিনি হঠাৎ এক কুটীরের সম্মুখে আসিয়া পড়িলেন। কুটীর দেখিয়া রাজার মনে সাহস হইল। ঐ কুটীরে সেই রাজপুত চিরঞ্জীব

তপস্যা করিতেছিল। রাজা সেই কুটীরের দরজায় দাঁড়াইয়া হাতজোড় করিয়া জল চাহিলে চিরঞ্জীব তৎক্ষণাৎ রাজাকে সুমিষ্ট বনফল ও শীতল জল দিল।

সেই ফল ও জল খাইয়া রাজার ক্ষুধা-তৃষ্ণা দূর হইল ; মনে হইতে লাগিল যেন তিনি নব-জীবন পাইলেন। এতক্ষণ তিনি চিরঞ্জীবের দিকে ভাল করিয়া লক্ষ্য করেন নাই ; এবার তাহাকে ভাল করিয়া লক্ষ্য করিয়া বোধ হইল, যেন তিনি প্রকৃত ঋষি নহেন। তখন রাজা অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে বলিলেন—'মহাশয়! আপনি আমার যে উপকার করিলেন,তাহার জন্য আপনার কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ। কিন্তু একটি কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি ; অনুগ্রহ করিয়া আমার অপরাধ মার্জনা করিবেন। আপনার কাজ-কর্ম সবই বিশুদ্ধ তপস্বীর মত ; কিন্তু আপনার আচার দেখিয়া মনে হয়, আপনি প্রকৃত ঋষি নহেন। এ বিষয়ে দয়া করিয়া আমার সংশয় দূর করিলে বড়ই বাধিত হইব।'

চিরঞ্জীব অগত্যা রাজার কাছে নিজের পরিচয় দিয়া বলিল—'মহারাজ! আমি রাজা গুণাধিপের গুণের কথা শুনিয়া তাঁহার কাছে চাকরীর জন্য গিয়াছিলাম ; কিন্তু রাজা রাজকার্য্য ছাড়িয়া সর্বদা অন্তঃপুরে থাকিতেন। এক বৎসর অপেক্ষা করিয়াও তাঁহার দেখা পাই নাই। সঙ্গে সম্বল যাহা ছিল, তাহাও ফুরাইয়া গেল। তখন ভিক্ষা করা ছাড়া আর উপায় ছিল না। ইহাতে সংসারের উপর বিতৃষ্ণা জন্মিল ; তপস্যা করিবার জন্য এই বনে চলিয়া আসিলাম। আমি ক্ষত্রিয় ; মনে এখনও বিষয়-বাসনা আছে। আপনি ঠিকই অনুমান করিয়াছেন।'

চিরঞ্জীবের কথা শুনিয়া রাজা মনে মনে লজ্জা পাইলেন। কিন্তু তিনি তখন নিজের কোন পরিচয়ই দিলেন না। চিরঞ্জীবের অনুমতি লইয়া সেদিন রাত্রে ঐ কুটীরেই কাটাইলেন!

পরদিন সকাল হইলে রাজা গুণাধিপ নিজের পরিচয় দিয়া চিরঞ্জীবকে রাজধানীতে লইয়া গেলেন এবং তাহাকে নিজের কাছে রাখিয়া দিলেন। চিরঞ্জীবও প্রাণপণে রাজার কাজ করে।

একদিন রাজা বিশেষ এক কাজে চিরঞ্জীবকে বিদেশে পাঠাইলেন। কাজ শেষ করিয়া ফিরিবার পথে চিরঞ্জীব দেখিল এক পুষ্করিণীর ধারে একটি মন্দির রহিয়াছে। সে মন্দিরে গিয়া দেবদর্শন করিল এবং মন্দির হইতে বাহির হইতেই একটি পরমাসুন্দরী কন্যা তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। চিরঞ্জীব তাহাকে দেখিয়া আর চোখ ফিরাইতে পারিল না; তাহার দিকে একদৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিল। ইহা দেখিয়া মেয়েটি বলিল—'ওহে পুরুষবর! তুমি কি জন্য এখানে আসিয়াছ ও এমন করিয়া আমার দিকে তাকাইয়া রহিয়াছই বা কেন?'

চিরঞ্জীব বলিল—'আমি রাজকার্য্যে বিদেশে গিয়াছিলাম! কাজ শেষ করিয়া স্বদেশে যাইতেছি। কিন্তু হঠাৎ এখানে তোমাকে দেখিয়া বড় বিস্মিত হইয়াছি।'

মেয়েটি বলিল—'তুমি যদি ঐ পুষ্করিণীতে স্নান কর, তাহা হইলে আমি তোমার কথা মানিয়া চলিব—'

মেয়েটির কথা শুনিয়া চিরঞ্জীব আনন্দিত মনে সেই পুষ্করিণীতে ডুব দিল। কিন্তু জলের মধ্য হইতে মাথা তুলিয়াই দেখিল, সে নিজের বাড়ীতে আসিয়াছে। তখন সে খুবই বিস্মিত হইয়া ভিজা কাপড় ছাড়িল এবং রাজার কাছে সকল কথা বলিল। এই অদ্ভুত কথা শুনিয়া রাজা চমৎকৃত হইলেন; বলিলেন—'তুমি শীঘ্র আমাকে সেখানে লইয়া চল।'

তখন দুইজনে রথে চড়িয়া সেই পুষ্করিণীর তীরে গিয়া পৌঁছিলেন। রথ হইতে নামিয়া তাঁহারা সেই মন্দিরে গিয়া দেবদর্শন করিয়া বাহির হইলেই সেই সুন্দরী মেয়েটি রাজার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল; তারপর বলিল—'মহারাজ! আপনি যে আজ্ঞা করিবেন আমি তাহাই করিব।'

রাজা বলিলেন—'যদি তুমি আমারই কথামত কাজ করিতে চাও, তাহা হইলে আমার প্রিয়পাত্র চিরঞ্জীবকে বিবাহ কর।'

মেয়েটি বলিল—'আমি আপনাকে বিবাহ করিব বলিয়া ঠিক করিয়াছি, এ অবস্থায় কেমন করিয়া উহাকে বিবাহ করিব?'

হইল এবং তাহার কাছে গিয়া বলিল—'সুন্দরি ! তুমি আমাকে বিবাহ কর। তুমি যদি আমাকে বিবাহ না কর, তাহা হইলে তোমার সম্মুখেই আমি আত্মহত্যা করিব।'

সোমদত্তের কথা শুনিয়া মদনসেনা তাহাকে অনেক সদুপদেশ দিল, অনেক বুঝাইল। কিন্তু সোমদত্ত তাহার কথা মানিল না। তখন মদনসেনা দেখিল, তাহার জন্য যুবকটি নিশ্চয়ই আত্মহত্যা করিবে। ইহার প্রাণরক্ষা করা একান্ত কর্তব্য। সে বলিল—'আগামী পঞ্চম দিবসে আমার বিবাহ হইবে। তারপর আমি শ্বশুর-বাড়ী যাইব। কিন্তু প্রতিজ্ঞা করিতেছি, তোমার সঙ্গে দেখা না করিয়া আমি স্বামী-সেবা করিব না। তুমি এখন বাড়ী যাও—'

সোমদত্ত মদনসেনার কথায় শান্ত হইয়া বাড়ী চলিয়া গেল।

তারপর পঞ্চম দিবসে মদনসেনার বিবাহ হইল। বিবাহের পর সে শ্বশুর-বাড়ী চলিয়া গেল।

তখন বেশ রাত্রি হইয়াছে। সকলে মদনসেনাকে শয়নঘরে দিয়া আসিল। কিন্তু সে স্বামীর সঙ্গে কোন কথা বলিল না; জড়সড় হইয়া বিছানার একপাশে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। স্বামী তাহাকে অনেক মিষ্ট কথা বলিতে লাগিলেন। মদনসেনা তবুও উত্তর দিল না। অবশেষে সেদিন সোমদত্তের সঙ্গে বাগানে যাহা ঘটিয়াছিল স্বামীর কাছে তাহার বর্ণনা করিয়া সে বলিল—'তুমি যদি এখন তাহার কাছে আমায় যাইতে না দাও তাহা হইলে আমি আত্মহত্যা করিব।'

মদনসেনার কথা শুনিয়া স্বামী তাহাকে প্রথমে অনেক নিষেধ করিলেন। তবুও মদনসেনার পূর্ব আগ্রহ কমিল না। তখন স্বামী বলিলেন—'প্রতিজ্ঞা পালন করা খুবই উচিত। তুমি যদি নিতান্তই যাইতে চাও, যাও—'

মদনসেনা স্বামীর সম্মতি লইয়া সোমদত্তের বাড়ী যাইবার জন্য পথে বাহির হইল। রাত্রি তখন অনেক। মদনসেনা পথ দিয়া একাকিনী চলিতেছে। এমন সময়ে এক চোর আসিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল—'তুমি কে? সারা গায়ে গহনা পরিয়া

রাজা বলিলেন—'তুমি এই মাত্র প্রতিজ্ঞা করিয়াছ, আমার কথা-মত কাজ করিবে। অতএব প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়া চিরঞ্জীবকে বিবাহ কর—'

অবশেষে রাজার কথায় সেই মেয়েটিও রাজী হইল। রাজা চিরঞ্জীবের সঙ্গে সেই মেয়েটির গান্ধর্বমতে বিবাহ দিয়া ছুইজনকে রাজ-ধানীতে লইয়া গেলেন। রাজার অনুগ্রহে চিরঞ্জীব তাহার স্ত্রীর সঙ্গে পরমসুখে দিন কাটাইতে লাগিল।

গল্প শেষ হইলে বেতাল জিজ্ঞাসা করিল—"মহারাজ! রাজা ও চিরঞ্জীবের মধ্যে কে বেশী সুজন ও উদার ?"

রাজা বলিলেন—"চিরঞ্জীব।"

—"কেন ?"

—"রাজা শেষে চিরঞ্জীবের অনেক উপকার করিলেন সত্য, কিন্তু সেই বনে রাজাকে ফল ও জল দিয়া চিরঞ্জীব যে উপকার করিয়াছিল, তাহার সহিত রাজার উপকারের তুলনা হয় না।"

ইহা শুনিয়া বেতাল ইত্যাদি—

নবম গল্প

বেতাল বলিল—"মহারাজ! মগধপুর নগরে বীরবর নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার অধীনে হিরণ্যদত্ত নামে এক ধনী বণিক বাস করিত। ঐ বণিকের মদনসেনা নামে এক কন্যা ছিল। কন্যাটি বড় সুন্দরী। বসন্তকালে একদিন ঐ মেয়েটি তাহার সখীগণের সঙ্গে বাগানে বেড়াইতেছিল। এমন সময়ে ধর্মদত্ত নামক বণিকের ছেলে সোমদত্তও বেড়াইবার জন্য ঐ বাগানে আসিল। কিছুক্ষণ বেড়াইবার পর দূর হইতে সে দেখিতে পাইল, একটি পরমাসুন্দরী মেয়ে তাহার সখীদের সহিত বাগানে বেড়াইতেছে। সে মেয়েটির রূপ দেখিয়া মুগ্ধ

এত রাত্রে একাকিনী পথ দিয়া কোথায় যাইতেছ? তোমার ভয় করিতেছে না?'

মদনসেনা বলিল—'আমি বণিক হিরণ্যদত্তের মেয়ে। আমার নাম মদনসেনা। প্রতিজ্ঞা পালনের জন্য আমি সোমদত্তের কাছে যাইতেছি—'

মদনসেনার কথা শুনিয়া চোর একটু হাসিল। তারপর মদনসেনার গা হইতে সমস্ত গহনা খুলিয়া লইবার উপক্রম করিতেই সে হাতজোড় করিয়া চোরের কাছে সকল ঘটনা প্রকাশ করিয়া বলিল—'ভাই! আমি বহুকষ্টে স্বামীকে রাজী করিয়াছি। তুমি আমার প্রতিজ্ঞা-পালনে বাধা দিও না। তুমি এইখানে থাক। আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি ফিরিবার সময় তোমাকে সমস্ত গহনা দিয়া যাইব।'

মদনসেনার কথায় বিশ্বাস করিয়া চোর সেখানে বসিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল।

সোমদত্তের ঘরে গিয়া মদনসেনা দেখিল, সোমদত্ত ঘুমাইতেছে। মদনসেনা তাহাকে জাগাইল। সোমদত্ত মদনসেনাকে দেখিয়া বিস্মিত হইল এবং বলিল—'এই গভীর রাত্রে তুমি একাকিনী কোথা হইতে আসিলে?'

মদনসেনা বলিল—'সেদিন বাগানে যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, তাহা পালন করিতে আসিয়াছি। আজ আমার বিবাহ হইয়াছে। আমি শ্বশুর-বাড়ী হইতে আসিতেছি—'

সোমদত্ত কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—'তোমার বাক্য-নিষ্ঠায় আমি বড়ই সন্তুষ্ট হইয়াছি। তুমি আজ মুক্ত হইলে। ফিরিয়া গিয়া মন দিয়া স্বামী-সেবা কর—'

মদনসেনা সোমদত্তের বাড়ী হইতে শ্বশুর-বাড়ী ফিরিয়া চলিল। চোর তখনও পথে বসিয়া তাহার অপেক্ষা করিতেছে। মদনসেনাকে এত শীঘ্র ফিরিতে দেখিয়া সে তাহাকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিল। মদনসেনা সমস্ত কথা বলিলে চোর সন্তুষ্ট হইয়া বলিল—'আমি তোমার গহনাগুলি চাই না। তুমি বড় সৎ ও সত্যবাদিনী। তুমি স্বচ্ছন্দে

শ্বশুর-বাড়ী চলিয়া যাও—'এই বলিয়া চোর চলিয়া গেল। মদনসেনাও স্বামীর কাছে ফিরিয়া আসিল। কিন্তু এবার আর তিনি মদনসেনার উপর সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না ; অসন্তুষ্ট হইয়া শুইয়া রহিলেন।"

গল্প শেষ করিয়া বেতাল জিজ্ঞাসা করিল—"মহারাজ! মদনসেনা, তাহার স্বামী, চোর ও সোমদত্ত—এই চারিজনের মধ্যে কাহার ভদ্রতা বেশী ?"

রাজা বলিলেন—"চোরের—"

—"কি করিয়া ?"

—"মদনসেনার স্বামী তাহাকে খুশী মনে সোমদত্তের বাড়ী যাইতে দেন নাই। তাহা না হইলে, সে ফিরিয়া আসিলে অসন্তুষ্ট হইবেন কেন! সোমদত্ত কেবল রাজদণ্ডের ভয়ে মদনসেনার কোন ক্ষতি করিল না ; তাহার প্রতিজ্ঞাপালন দেখিয়া নহে। আর, মদনসেনার স্বামীগৃহ ছাড়িয়া ঐ অন্যায় প্রতিজ্ঞাপালন করা নিতান্তই অনুচিত হইয়াছে। কিন্তু চোরেরা সাধারণতঃ অর্থলোভী। সে মদনসেনার সকল কথায় সন্তুষ্ট হইয়া যে লোভ সংবরণ করিল তাহা কম উদারতার কথা নহে।"

ইহা শুনিয়া বেতাল ইত্যাদি—

দশম গল্প

বেতাল বলিল—"মহারাজ! গৌড়দেশে বর্দ্ধমান নগরে ধর্মধ্বজ নামে এক রাজা ছিলেন। বসন্তকালে একদিন তাঁহার তিন রাণীকে লইয়া তিনি উপবনে বেড়াইতে গেলেন। সেই উপবনে একটি চমৎকার পুষ্করিণী ছিল। তাহাতে অজস্র পদ্ম ফুটিয়াছে দেখিয়া রাজা নিজেই জলে নামিলেন এবং কয়েকটি ফুল তুলিয়া আনিয়া এক রাণীর হাতে দিলেন। হঠাৎ একটি ফুল রাণীর হাত হইতে তাঁহার বাঁ-পায়ের উপর পড়িল। সেই আঘাতে রাণীর পাখানি ভাঙ্গিয়া গেল। রাজা ব্যস্ত

হইয়া রাণীর পায়ে ঔষধ দিতে লাগিলেন।

এদিকে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। সেই সঙ্গে জ্যোৎস্না ছড়াইয়া চাঁদ উঠিল। দ্বিতীয় রাণীর গায়ে জ্যোৎস্না লাগিতেই তাঁহার গা তাহাতে জায়গায় জায়গায় পুড়িয়া গেল!

আর, ঠিক সেই সময়ে উপবনের পাশে এক গৃহস্থের বাড়ীতে উদূখলের শব্দ হইল। সেই শব্দ তৃতীয় রাণীর কানে যাইতেই তাঁহার ভয়ঙ্কর মাথা ধরিল; তিনি অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গেলেন।"

গল্প শেষ করিয়া বেতাল জিজ্ঞাসা করিল—"মহারাজ! রাজার এই তিন রাণীর মধ্যে কে সবচেয়ে বেশী সুকুমারী?"

রাজা বলিলেন—"জ্যোৎস্না লাগিয়া যাহার গা পুড়িয়া গেল, আমার মতে সে-ই সকলের চেয়ে বেশী সুকুমারী।"

ইহা শুনিয়া বেতাল ইত্যাদি—

একাদশ গল্প

বেতাল বলিল—"মহারাজ! পুণ্যপুর নগরে বল্লভ নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি প্রজাদের বড় ভালবাসিতেন। তাঁহার মন্ত্রীর নাম ছিল সত্যপ্রকাশ। রাজা একদিন মন্ত্রীকে বলিলেন—'দেখ, আমি কিছুকাল বিশ্রাম করিব; তুমি আমার হইয়া রাজকার্য্যের ভার লও।' এই বলিয়া তিনি সত্যপ্রকাশের উপর সমস্ত রাজ্যের ভার দিয়া নিশ্চিন্ত-মনে বিশ্রাম ভোগ করিতে লাগিলেন। এদিকে সত্যপ্রকাশও দিনরাত্রি কঠিন রাজকার্য্য করিয়া বড় ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন।

একদিন তিনি নিজের বাড়ীতে নির্জনে বসিয়া আছেন। তাঁহার মুখ বিষণ্ণ। এমন সময়ে তাঁহার স্ত্রী আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'আজকাল সব সময়ই তোমাকে এমন চিন্তিত দেখিতে পাই কেন? কি জন্যই বা তুমি দিন দিন এমন দুর্বল হইয়া পড়িতেছ?'

সত্যপ্রকাশ বলিলেন—'রাজা আমার উপর তাঁহার সমস্ত রাজ্যের

ভার দিয়া নিশ্চিন্তমনে বিশ্রাম করিতেছেন। দিনরাত্রি রাজ্যের নানা বিষয় চিন্তা করিয়া আমি দুর্বল হইয়া পড়িতেছি।'

স্ত্রী বলিলেন—'তুমি এতদিন একা সমস্ত রাজ্য চালাইলে, এখন রাজার কাছ হইতে কিছুদিনের ছুটি লইয়া তীর্থ ভ্রমণ কর।'

সত্যপ্রকাশ স্ত্রীর কথামত রাজার কাছ হইতে কিছুদিনের ছুটি লইয়া তীর্থভ্রমণে বাহির হইলেন। নানা তীর্থ ঘুরিয়া তিনি শেষে সেতুবন্ধ-রামেশ্বরে আসিয়া পেঁাছিলেন। সেখানে সমুদ্রের ধারে মহাদেবের মন্দির। তিনি মন্দিরের মধ্যে মূর্তি দেখিয়া বাহির হইয়া আসিতেই দেখিতে পাইলেন সমুদ্রের নীল জলের মধ্য হইতে একটি বিশাল সোনার গাছ বাহির হইল ; আর, তাহার একটি ডালে বসিয়া এক পরমাসুন্দরী মেয়ে বীণা বাজাইয়া মধুর স্বরে গান গাহিতেছে। সত্যপ্রকাশ একদৃষ্টিতে সেদিকে তাকাইয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ পরে গাছটি সমুদ্রের জলে মিলাইয়া গেল।

এই অদ্ভুত ঘটনা দেখিয়া সত্যপ্রকাশ শীঘ্র দেশে ফিরিয়া আসিলেন এবং রাজার কাছে তাহা প্রকাশ করিলেন। শুনিয়া রাজার মনেও কৌতূহল জন্মিল। তিনি আবার মন্ত্রীর উপর রাজ্যের ভার দিয়া ঐ অদ্ভুত ব্যাপার দেখিবার জন্য সেতুবন্ধ-রামেশ্বরে চলিয়া গেলেন। সেখানে পেঁাছিয়া নির্দিষ্ট সময়ে মহাদেবের পূজা করিয়া বাহির হইবামাত্র দেখিলেন, সত্যপ্রকাশ যাহা বর্ণনা করিয়াছিলেন, তাহা ঠিক। সমুদ্রের নীল জলের মধ্য হইতে একটি সোনার গাছ বাহির হইয়াছে ও তাহার একটি ডালে বসিয়া এক পরমাসুন্দরী মেয়ে বীণা বাজাইয়া গান গাহিতেছে। রাজা মেয়েটির রূপ দেখিয়া ও তাহার গান শুনিয়া মুগ্ধ হইলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ সমুদ্রের জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িয়া সাঁতরাইয়া সেই গাছে উঠিলেন। গাছটিও নিমেষে তাঁহাকে লইয়া পাতালে চলিয়া গেল।

পাতালে গিয়া মেয়েটি রাজাকে জিজ্ঞাসা করিল—'ওহে বীরপুরুষ! তুমি কে? কি জন্য এখানে আসিয়াছ?'

রাজা বলিলেন—'আমি পুণ্যপুরের রাজা ; আমার নাম বল্লভ।

আমি তোমাকে বিবাহ করিতে চাই।'

মেয়েটি বলিল—'আমি তোমার সাহসে সন্তুষ্ট হইয়াছি। তুমি যদি কৃষ্ণচতুর্দশীতে আমার সঙ্গে কোন সম্পর্ক না রাখ, তবে তোমাকে বিবাহ করিতে পারি।'

রাজা তাহাতেই সম্মত হইলেন। তারপর সেখানে গান্ধর্বমতে দুইজনের বিবাহ হইয়া গেল। রাজা নূতন রাণীকে লইয়া পরম সুখে কাল কাটাইতে লাগিলেন। এদিকে কৃষ্ণচতুর্দশী উপস্থিত হইল। রাণী রাজাকে অনেক অনুনয় করিয়া তাঁহার কাছে থাকিতে নিষেধ করিলেন। রাজাও প্রতিজ্ঞামত তৎক্ষণাৎ অন্য জায়গায় চলিয়া গেলেন। কিন্তু রাজা মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন,—'রাণী কি জন্য আমাকে তাঁহার কাছে থাকিতে বার বার নিষেধ করিলেন? ইহার কারণ যতক্ষণ না জানিতে পারিতেছি, ততক্ষণ আমি নিশ্চিন্ত হইতে পারিব না।' এই বলিয়া তিনি আড়ালে থাকিয়া সমস্ত লক্ষ্য করিতে লাগিলেন।

রাত্রি প্রায় অর্দ্ধেক কাটিয়া গেল। এমন সময় এক ভয়ঙ্কর রাক্ষস আসিয়া রাণীকে ধরিল। ইহা দেখিয়া রাজা রাগে তৎক্ষণাৎ খড়্গ হাতে সেখান হইতে বাহির হইয়া রাক্ষসের মাথা কাটিয়া ফেলিলেন।

রাক্ষস বধ হওয়াতে রাণীর মনে আর আনন্দ ধরে না। তিনি রাজাকে বলিতে লাগিলেন—'তুমি আজ আমাকে রক্ষা করিলে। এতকাল আমি কি কষ্ট যে ভোগ করিতেছিলাম তাহা আর কি বলিব!'

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন—'কি জন্য তোমাকে এমন কষ্ট ভোগ করিতে হইতেছিল বল।'

রাণী বলিলেন—'মহারাজ! আমি বিদ্যাধর নামক গন্ধর্বরাজ্যের মেয়ে। আমার নাম রত্নমঞ্জরী। আমি প্রত্যহ আমার পিতার খাইবার সময় তাঁহার সম্মুখে বসিয়া না থাকিলে তিনি তৃপ্তির সঙ্গে খাইতে পারিতেন না। এই জন্য আমি প্রত্যহ তাঁহার খাইবার সময় উপস্থিত থাকিতাম। কিন্তু একদিন তিনি খাইতে বসিলে আমি খেলায় মত্ত

রহিলাম ; তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলাম না। তাঁহারও খাওয়া হইল না। তখন তিনি রাগে আমাকে এই বলিয়া শাপ দিলেন – 'তুই আজ থেকে রসাতলে বাস করিবি, আর, কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশীতে এক রাক্ষস আসিয়া তোকে অনেক যন্ত্রণা দিবে।' তাহা শুনিয়া আমার বড় কষ্ট হইল। আমি তাঁহার পায়ে ধরিয়া বিস্তর কাঁদিলাম। বলিলাম— 'আমার শাপমোচনের উপায় করিয়া দিন।' তখন তিনি স্নেহে গলিয়া বলিলেন। 'একজন বীরপুরুষ আসিয়া তোমাকে উদ্ধার করিবে।



আমি প্রত্যহ তাঁহার খাইবার সময় উপস্থিত থাকিতাম

মহারাজ ! এতদিন আমি সেই শাপে যন্ত্রণা পাইতেছিলাম। তুমি আসিয়া আমাকে উদ্ধার করিলে। এখন অনুমতি দাও, পিতার কাছে যাই।'

রাজা বলিলেন—'আমি যদি তোমার উপকারই করিয়া থাকি ; তাহা হইলে পিতার কাছে যাইবার আগে একবার আমার রাজধানীতে চল।'

রত্নমঞ্জরী সম্মত হইয়া রাজার সঙ্গে রাজধানীতে গেল। সেখানে কিছুদিন বাস করিয়া পিতার কাছে যাইবার জন্য আবার রাজার অনুমতি চাহিল। রাজা নিতান্ত অনিচ্ছার সঙ্গে রাজী হইলেন। তখন

রত্নমঞ্জরী বলিল,—'মহারাজ! মানুষের সঙ্গে এতকাল বাস করিয়া আমার গন্ধর্বের স্বভাব নষ্ট হইয়াছে, আমি মানুষের মত হইয়াছি। পিতার কাছে গেলে এখন আর সেরকম আদর পাইব না। অতএব তোমার কাছেই থাকিব।'

রাণীর কথা শুনিয়া রাজা খুব আনন্দিত হইলেন। তিনি আবার রাজকার্য্য ছাড়িয়া রাণীর সঙ্গে অন্তঃপুরে কাটাইতে লাগিলেন। ইহা দেখিয়া সত্যপ্রকাশ দুঃখে প্রাণত্যাগ করিল।"

গল্পের শেষে বেতাল জিজ্ঞাসা করিল—"মহারাজ! কি কারণে সত্যপ্রকাশ প্রাণত্যাগ করিল?"

রাজা বলিলেন—"সত্যপ্রকাশ দেখিল, রাজা রাজকার্য্যে জলাঞ্জলি দিলেন। প্রজারা অনাথ হইল। আর কেহ আমাকে সেরূপ সম্মান করিবে না। দিবারাত্র এই দুশ্চিন্তায় সে মরিয়া গেল।"

ইহা শুনিয়া বেতাল ইত্যাদি—

দ্বাদশ গল্প

বেতাল বলিল—"মহারাজ! চূড়াপুরে দেবস্বামী নামে এক ব্রাহ্মণ থাকিতেন। তিনি যেমন বিদ্বান তেমন রূপবান, আবার তেমনই ধনী ছিলেন। তাঁহার স্ত্রীর নাম ছিল লাবণ্যবতী। তাঁহার মত সুন্দরী ত্রিভুবনে ছিল না। তাঁহারা স্বামী-স্ত্রীতে পরম সুখেই কাল কাটাইতেছিলেন।

তখন গ্রীষ্মকাল। একদিন রাত্রে খুব গরম বোধ হওয়াতে তাঁহারা দুইজনে বাড়ীর ছাদে ঘুমাইতেছিলেন। সেই সময় এক গন্ধর্ব বিমানে চড়িয়া আকাশপথে বেড়াইতেছিল। হঠাৎ সে সুন্দরী লাবণ্যবতীকে দেখিতে পাইয়া সেই ঘুমন্ত অবস্থাতেই তাঁহাকে বিমানে তুলিয়া পলায়ন করিল।

তাহার কিছুক্ষণ পরে ব্রাহ্মণের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। তাঁহার পাশে লাবণ্যবতীকে দেখিতে না পাইয়া ব্রাহ্মণ বাড়ীর চারিধারে তাঁহাকে খুঁজিলেন; কিন্তু কোথায়ও তাঁহাকে পাইলেন না। তখন তিনি নিতান্ত

বিষণ্ণ হইয়া রাত্রি ভোরের আশায় বসিয়া রহিলেন।

পরদিন সকাল হইবামাত্র ব্রাহ্মণ আবার চারিধারে লাবণ্যবতীকে অনেক খুঁজিলেন ; কিন্তু সবই বৃথা হইল। তখন তিনি মনের দুঃখে সংসার ছাড়িয়া, সন্ন্যাসীর বেশে দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

একদিন তখন বেলা দ্বিপ্রহর, দেবস্বামী ক্ষুধায় বড় কাতর হইয়া পড়িলেন এবং ঘুরিতে ঘুরিতে এক ব্রাহ্মণের বাড়ীতে অতিথি হইয়া বলিলেন—'আমি ক্ষুধায় বড়ই কাতর। আমাকে কিছু খাইতে দিয়া আমার প্রাণ বাঁচাও।'

ব্রাহ্মণ তৎক্ষণাৎ দেবস্বামীকে একবাটি দুধ খাইতে দিলেন। কিন্তু কিছুক্ষণ আগে একটি কালসাপ আসিয়া ঐ দুধে মুখ দেওয়ায় উহা বিষাক্ত হইয়াছিল। সেইজন্য দুধ পান করিবার সঙ্গে সঙ্গে দেবস্বামীর শরীর অবশ হইয়া আসিল। তিনি ব্রাহ্মণকে 'তুমি ব্রহ্মহত্যা করিলে' এই কথা বলিয়াই মাটিতে ঢলিয়া পড়িলেন ও মারা গেলেন।

হঠাৎ ব্রহ্মহত্যা দেখিয়া গৃহস্থ ব্রাহ্মণও বিষণ্ণ হইলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ বাড়ীর ভিতরে গিয়া স্ত্রীকে বলিলেন—'তুই দুধে বিষ মিশাইয়া রাখিয়াছিলি ; সেইজন্যই আজ ব্রহ্মহত্যা হইল। তোর মত পাপিষ্ঠার মুখ আমি আর দেখিতে চাহি না। তুই আমার বাড়ী হইতে দূর হইয়া যা—।' এই বলিয়া ব্রাহ্মণ তৎক্ষণাৎ ব্রাহ্মণীকে বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিলেন।"

এই বলিয়া বেতাল জিজ্ঞাসা করিল—"মহারাজ! এক্ষেত্রে দোষী কে?"

রাজা বলিলেন—"কালসাপ যে, সে দোষী হইতে পারে না ; কারণ, তাহার মুখে বিষ থাকিবেই। ব্রাহ্মণ বা ব্রাহ্মণী জানিতেন না যে দুধে বিষ আছে। অতিথিরও কোন দোষ নাই ; কারণ তিনিও না জানিয়া দুধ পান করিয়াছিলেন। কিন্তু গৃহস্থ ব্রাহ্মণ সকল ব্যাপার অনুসন্ধান না করিয়া স্ত্রীকে বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিলেন। ইহাতে তিনিই দোষী।"

ইহা শুনিয়া বেতাল ইত্যাদি—

ত্রয়োদশ গল্প

বেতাল বলিল—"মহারাজ! চন্দ্রহৃদয় নগরে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার নাম রণধীর। তিনি খুব শক্তিশালী রাজা ছিলেন। প্রজারা তাঁহার রাজত্বে নিরাপদে বাস করিত। কিন্তু একবার নগরে ভয়ানক চুরি আরম্ভ হইল। নগরবাসীরা চোরের অত্যাচারে দিন দিন উদ্ব্যস্ত হইয়া উঠিল। আর কোন উপায় না দেখিয়া শেষে তাহারা সকলে রাজার কাছে গিয়া নিজেদের দুঃখের কথা জানাইল। রাজা সকলকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন—'যাহা হইবার তাহা হইয়াছে। পরে আর যাহাতে চুরি না হয়, সে বিষয়ে ব্যবস্থা করিতেছি। তোমরা নিশ্চিন্ত হইয়া ঘরে যাও।'

প্রজারা রাজার কথা শুনিয়া নিশ্চিন্ত মনে ঘরে গেল। রাজাও নগরের চারিধারে নূতন প্রহরী বসাইলেন এবং আদেশ দিলেন—'চোরকে ধরিতে পারিলেই শূলে দিবে।' তবুও কোন ফল হইল না; বরং চুরি আরও বাড়িয়া গেল। আবার নগরবাসীরা রাজার কাছে আসিয়া নালিশ করিতে লাগিল।

রাজা বলিলেন—'আচ্ছা, আজ রাত্রিতে আমি নিজে নগরে পাহারা দিব। তোমরা বাড়ী যাও।'

নগরবাসীরা রাজার কথায় বাড়ী চলিয়া গেল।

তারপর সন্ধ্যা হইলে রাজা অস্ত্র-শস্ত্র লইয়া ছদ্মবেশে নগর রক্ষা করিতে বাহির হইলেন। তিনি একা চলিতেছেন। কিছুদূর গিয়া দেখিলেন, একজন অপরিচিত লোক আসিতেছে। তাহাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'তুমি কে? তোমার বাড়ী কোথায়? কোথায় যাইতেছ?'

লোকটি বলিল—'আমি চোর; কিন্তু তুমি কে? কি জন্য আমার পরিচয় লইতেছ?'

রাজা ছল করিয়া বলিলেন—'আমিও চোর।'

ইহা শুনিয়া লোকটি আনন্দিত হইয়া বলিল—'চল দুইজনে একসঙ্গে চুরি করিতে যাই।'

রাজা চোরের কথায় রাজী হইলেন। চোর রাজাকে সঙ্গে লইয়া এক ধনীর বাড়ী হইতে অনেক ধনদৌলত চুরি করিয়া নগরের বাহির হইল; তারপর কিছুদূর গিয়া এক সুড়ঙ্গ দিয়া পাতালে নামিল। সেখানে এক বাড়ীতে সে বাস করিত। সে রাজাকে তাহার বাড়ীর দরজায় বসাইয়া ভিতরে চলিয়া গেল। রাজা একা বসিয়া আছেন। সেই সময়ে এক দাসী আসিয়া রাজার পরিচয় লইল এবং সমস্ত শুনিয়া বলিল—'তুমি কেন এই ভয়ঙ্কর দস্যুর বাড়ীতে আসিয়াছ? সে আসিয়া পড়িবার আগেই পালাও। না হইলে, সে আসিয়াই তোমাকে মারিয়া ফেলিবে।'

দাসীর কথা শুনিয়া রাজার মনে ভয় হইল; বলিলেন—'আমি ত পথ জানি না। তুমি যদি দয়া করিয়া পলাইবার পথ দেখাইয়া দাও, আমার প্রাণরক্ষা হয়।' দাসী তখন রাজাকে পথ দেখাইয়া দিল; রাজাও সেই পথে পলাইয়া রাজবাড়ীতে উপস্থিত হইলেন।

পরদিন সকাল হইলেই রাজা রণধীর বহু সৈন্যসামন্ত লইয়া সুড়ঙ্গ-পথে নামিয়া চোরের বাড়ী আক্রমণ করিলেন। এক রাক্ষস ঐ পাতালপুরী রক্ষা করিত। চোর দেখিল, তাহার আর রক্ষা নাই। তখন সে রাক্ষসের শরণাপন্ন হইল। রাক্ষস চোরকে অভয় দিয়া বলিল—'তোমার কোন ভয় নাই; আমি এখনই রাজার সমস্ত সৈন্য ধ্বংস করিব।'

এই বলিয়াই রাক্ষস মহাবিক্রমে রাজার সৈন্যগণকে আক্রমণ করিল; সম্মুখে হাতী, ঘোড়া, সৈন্য যাহা পায় তাহাই ধরিয়া গিলিয়া ফেলিতে লাগিল। এমন করিয়া রাক্ষস রাজার প্রায় সমস্ত সৈন্য খাইয়া ফেলিল। বাকী যাহারা ছিল, ব্যাপার দেখিয়া তাহারা আর দাঁড়াইল না; যে যেদিকে পারিল পলাইতে লাগিল। রাজাও দেখিলেন,না পলাইলে প্রাণে বাঁচিবেন না। তিনিও পলায়ন করিলেন।

এদিকে রাক্ষসকে দলে পাইয়া চোরের সাহস বাড়িয়া গিয়াছিল। সে রাজার পিছনে ছুটিতে ছুটিতে বলিতে লাগিল—'ওরে কাপুরুষ! তোকে ধিক্! ক্ষত্রিয়রা কখনও যুদ্ধে ভঙ্গ দেয় না। তুই ক্ষত্রিয় কুলে কুলাঙ্গার! রাজা হইয়া পলাইতেছিস্? ইহাতে লোকে তোর নিন্দা করিবে।' এই বলিতে বলিতে সে রাজাকে প্রায় ধরিয়া ফেলিল।

চোরের ধিক্কারে রাজার মনে অভিমান জাগিল। সত্যই ত তিনি রাজা ও ক্ষত্রিয়ের সন্তান। যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করা তাঁহার অনুচিত। তিনি খড়্গ হাতে ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। চোরের সঙ্গে তাঁহার ঘোর যুদ্ধ হইল। যুদ্ধে চোর পারিল না; রাজা তাহাকে বাঁধিয়া রাজধানীতে লইয়া আসিলেন।

পরদিন সকালে রাজা আদেশ দিলেন—'চোরকে গাধায় চড়াইয়া সারা নগরের পথে পথে ঘুরাইয়া আনিয়া শূলে দাও।'

রাজার আদেশে প্রহরী চোরকে গাধার পিঠে চড়াইয়া নগরের পথে পথে লইয়া চলিল। চোর সকলেরই ক্ষতি করিয়াছিল। এজন্য তাহার দুর্দশায় সকলেই আনন্দিত। কিন্তু ধর্মধ্বজ নামক বণিকের বাড়ীর সম্মুখে আসিলে বণিকের কন্যা শোভনা চোরকে জানালা দিয়া দেখিয়া মুগ্ধ হইল। সে ছুটিয়া গিয়া তাহার বাবাকে বলিল—'বাবা! চোরকে উদ্ধার কর। আমি মনে মনে উহাকে বিবাহ করিয়াছি।'

ধর্মধ্বজ শোভনার কথা শুনিয়া অবাক্ হইলেন; বলিলেন—'সে কি করিয়া হইবে? চোর নগরের প্রায় সকলেরই ক্ষতি করিয়াছে; উহার জন্য রাজার অনেক সৈন্য মারা গিয়াছে। এ অবস্থায় রাজা উহাকে ছাড়িবেন না।'

শোভনা বলিল—'তুমি যেমন করিয়া পার রাজার কাছে গিয়া উহাকে ছাড়াইয়া আন। ছাড়াইয়া না আনিলে আমি আত্মহত্যা করিব।'

ধর্মধ্বজ কন্যাকে বড়ই ভালবাসিতেন। তিনি রাজার কাছে গিয়া নিবেদন করিলেন—'মহারাজ! আমার যাহা কিছু সম্পত্তি আছে, সবই দিতেছি, আপনি চোরকে ছাড়িয়া দিন।'

রাজা ধর্মধ্বজের প্রার্থনা শুনিলেন না ; বলিলেন—'চোর আমার ও নগরবাসীদের বিস্তর ক্ষতি করিয়াছে। তাহাকে ছাড়িতে পারি না।'

তখন ধর্মধ্বজ বিষণ্নমনে বাড়ী ফিরিয়া কন্যাকে জানাইলেন—'মা, আমার সব সম্পত্তি দিতে চাহিলেও রাজা চোরকে ছাড়িলেন না।'

এই অবসরে শোভনার ঐ অদ্ভুত কথা নগরের চারিধারে ছড়াইয়া



কাত্যায়নী দেবী আবির্ভূতা হইলেন

পড়িয়াছিল। চোরও বধ্যভূমিতে পৌঁছিয়া তাহা শুনিতে পাইল। শুনিয়া সে প্রথমে খুব হাসিল ; তারপরই কাঁদিতে আরম্ভ করিল। রাজপুরুষরা তৎক্ষণাৎ তাহাকে শূলে চড়াইলেন।

এই সংবাদ শোভনার কাছে পৌঁছিলে সে সহমরণের জন্য বধ্য-ভূমিতে আসিয়া উপস্থিত হইল। তারপর দুইজনেরই চিতা সাজান

ব্রাহ্মণযুবকের ঘুম ভাঙিয়া গেল। সে চোখ মেলিয়া রাজকন্যাকে দেখিয়া আর চোখ ফিরাইতে পারিল না ; রাজকন্যাও তাহার দিকে তাকাইয়া অবাক। সখীরাও এই ব্যাপার দেখিয়া হতবুদ্ধির মত দাঁড়াইয়া রহিল। শেষে তাহারা রাজকন্যাকে লইয়া তাড়াতাড়ি রাজবাড়ীতে ফিরিয়া গেল। কিন্তু ব্রাহ্মণযুবক মনস্বী আর উঠিতে পারিল না, অজ্ঞান হইয়া সেখানে পড়িয়া রহিল।

সেই সময় ভূদেব ও শশী নামে দুইজন ব্রাহ্মণ কামরূপী বিদ্যা শিখিয়া বহুদিন পরে বাড়ী ফিরিতেছিল। পথশ্রমে ও রৌদ্রে দুইজনেই বড় ক্লান্ত। তাহারাও বিশ্রাম করিবার জন্য ঐ উপবনে গাছের ছায়ায় উপস্থিত হইয়াই দেখিল সেখানে এক ব্রাহ্মণযুবক অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া আছে। দেখিয়া দুইজনেই আশ্চর্য্য হইল। তখন তাহারা অনেক করিয়া মনস্বীর চৈতন্য ফিরাইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল—'তুমি কে ? কি করিয়া তোমার এমন অবস্থা হইল ?'

মনস্বী উত্তর করিল—'যে আমার দুঃখ দূর করিতে পারিবে আমি কেবল তাহার কাছেই আমার মনের কথা বলিব। অন্য লোকের কাছে বলিয়া লাভ কি ?'

ভূদেব বলিল—'আমাকে তোমার মনের দুঃখ বল। আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, নিশ্চয়ই তোমার দুঃখ দূর করিব।'

তখন মনস্বী বলিল—'কিছুক্ষণ আগে আমি অপরূপসুন্দরী এক রাজকন্যাকে দেখিয়াছি। কিন্তু তাহাকে বেশীক্ষণ দেখিতে পাই নাই ; সে যেন কোথায় চলিয়া গিয়াছে। আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, তাহাকে বিবাহ করিতে না পারিলে প্রাণ বিসর্জন দিব।'

শুনিয়া ভূদেব হাসিয়া বলিল—'আমি নিশ্চয় তোমার সঙ্গে তাহার মিলন ঘটাইয়া দিব।' এই বলিয়া মনস্বীকে নিজের বাড়ীতে লইয়া গেল।

সেখানে গিয়া ভূদেব মনস্বীকে বলিল—'আমি তোমাকে একটি মন্ত্র শিখাইয়া দিতেছি। মন্ত্রটি জপ করিলে তুমি ষোল বৎসরের মেয়ের মত হইবে ; আবার তোমার যখন ইচ্ছা হইবে নিজের মূর্তি

হইয়াছে ; শোভনা চোরের পাশে চিতায় উঠিয়া বসিয়াছে, লোকেরা চিতায় আগুন দিতেছে, এমন সময় সেখানে কাত্যায়নী দেবী আবির্ভূতা হইলেন। তিনি শোভনাকে বলিলেন—'বৎস ! তোমার সাহস ও সতীত্ব দেখিয়া আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি। বর প্রার্থনা কর।'

শোভনা বলিল—'মা ! যদি প্রসন্ন হইয়া থাক, তবে এই চোরকে বাঁচাইয়া দাও।'

দেবী 'তথাস্তু' বলিয়া চোরকে তৎক্ষণাৎ বাঁচাইয়া দিয়া অদৃশ্য হইলেন।"

গল্প শেষ করিয়া বেতাল জিজ্ঞাসা করিল—"মহারাজ ! চোর কিজন্য প্রথমে হাসিয়াছিল ও পরে কাঁদিয়াছিল ?"

রাজা বলিলেন—"চোর ভাবিল,—'কি অদ্ভুত ! আমি মরিতে যাইতেছি এমন সময় মেয়েটি আমাকে ভালবাসিল !' এইজন্য সে প্রথমে হাসিয়াছিল। তারপর ভাবিল—'এই মেয়েটি আমার জন্য রাজাকে তাহার সর্বস্ব দিতে চাহিয়াছিল ; কিন্তু প্রতিদানে আমি ইহার কি উপকার করিতে পারিতাম ?' এই কথা মনে করিয়া দুঃখে কাঁদিল।"

ইহা শুনিয়া বেতাল ইত্যাদি—

চতুর্দশ গল্প

রাজা আবার বেতালকে লইয়া সন্ন্যাসীর কাছে চলিতেছেন। কিছুদূর গিয়া বেতাল বলিল—"মহারাজ ! কুসুমবতী নগরের রাজা সুবিচারের একটি পরমাসুন্দরী কন্যা ছিল। তাহার নাম চন্দ্রপ্রভা। বসন্তকালে একদিন চন্দ্রপ্রভা তাহার সখীগণের সঙ্গে উপবনে বেড়াইতে গেল। তখন এক সুপুরুষ ব্রাহ্মণযুবকও পথশ্রমে ক্লান্ত হইয়া ঐ উপবনের একধারে একটি গাছের ছায়ায় ঘুমাইতেছিল। তাহার কথা কেহই জানিত না। চন্দ্রপ্রভা সখীদের লইয়া বেড়াইতে বেড়াইতে সেখানে গিয়ে উপস্থিত হইল। সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের পায়ের শব্দে

ধরিতে পারিবে।'

মনস্বী ভূদেবের কাছ হইতে মন্ত্রটি শিখিয়া জপ করিতেই ষোল বৎসরের মেয়ে হইয়া গেল। ভূদেবও আশী বৎসরের বৃদ্ধ সাজিয়া মনস্বীকে বধূ সাজাইয়া রাজসভায় গিয়া উপস্থিত হইল।

রাজা সুবিচার বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ দেখিয়া খুব সম্মান করিয়া তাহাকে বসিতে আসন দিলেন। ভূদেব রাজাকে আশীর্বাদ করিলে রাজা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'ঠাকুর! আপনি কোথা হইতে আসিতেছেন?'

ভূদেব বলিল—'আমি গঙ্গার পূর্বপার হইতে আসিতেছি। সঙ্গে যে মেয়েটিকে দেখিতেছেন, ইনি আমার পুত্রবধূ। ইহাকে বাপের বাড়ী হইতে আনিতে গিয়াছিলাম। বাড়ী ফিরিয়া দেখি, ওলাউঠার ভয়ে গ্রামের সকলে দেশ ছাড়িয়া পলাইয়া গিয়াছে। বাড়ীতে আমার বিশ বৎসর বয়সের ছেলে ও ব্রাহ্মণী ছিল। তাহারও সেই সময়ে কোথায় চলিয়া গিয়াছে। কোথায় গেলে যে তাহাদের সন্ধান পাইব জানি না। তাহাদের দেখা না পাইলে আমি মরিয়া যাইব। এখন আমার এই পুত্রবধূকে কোন বিশ্বাসী লোকের কাছে রাখিয়া তাহাদের সন্ধানে বাহির হইব বলিয়া ঠিক করিয়াছি। তা' আপনার মত বিশ্বাসী আর কে আছে? আমি যতদিন না ফিরিয়া আসি, আপনি আমার এই পুত্রবধূটিকে আপনার কাছে রাখুন।'

ব্রাহ্মণের কথা শুনিয়া রাজা মনে মনে বলিলেন—'ভাল মুস্কিলে পড়িলাম। পরের মেয়েকে ঘরে রাখাও বিপদ, আবার না রাখিলেও ব্রাহ্মণ চটিয়া যাইবে। তবে এক কাজ করা যাইতে পারে। ইহাকে আমার মেয়ে চন্দ্রপ্রভার কাছে রাখিয়া দি; তাহা হইলে সব দিক বজায় থাকিবে।' এই স্থির করিয়া তিনি ব্রাহ্মণকে বলিলেন—'ঠাকুর! আপনি যাহা আজ্ঞা করিতেছেন, তাহাই হইবে।'

রাজার কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণ তাহার পুত্রবধূকে রাখিয়া, রাজাকে আশীর্বাদ করিতে করিতে চলিয়া গেল। রাজাও অন্তঃপুরে গিয়া রাজকুমারী চন্দ্রপ্রভার হাতে মেয়েটির ভার দিয়া আসিলেন।

মেয়েটি চন্দ্রপ্রভার সমবয়সী ; দেখিতেও অতি চমৎকার। শীঘ্রই দুইজনের বড় ভাব হইল। দুইজনে দুইজনকে বড় ভালবাসেন। দুইজনে একসঙ্গে শয়ন করেন,একসঙ্গে আহার করেন, একসঙ্গে বেড়ান। রাজকন্যা একদণ্ডও মেয়েটিকে ছাড়িয়া থাকিতে পারেন না। একদিন সে রাজকন্যার মনের ভাব পরীক্ষার জন্য জিজ্ঞাসা করিল—'আচ্ছা ভাই! সব সময়ে তুমি কি ভাব বল ত? প্রায়ই তোমার মুখ মলিন দেখি কেন?'

রাজকন্যা বলিলেন—'ভাই! বসন্তকালে একদিন সখীদের সঙ্গে উপবনে বেড়াইতে গিয়াছিলাম। দৈবাৎ সেখানে এক সুন্দর ব্রাহ্মণ-যুবককে দেখিতে পাই। তখন হইতে তাহার কথা কিছুতেই ভুলিতে পারিতেছি না। কিন্তু সে কে, কোথায় বা তাহার বাস, তাহার নামই বা কি এসব কিছুই জানি না। লজ্জায় এসব কথা কাহারও কাছে বলিতে পারি না। তুমি জিজ্ঞাসা করিলে, তাই তোমাকে বলিলাম। তুমি কাহারও কাছে এ কথা বলিও না।'

রাজকন্যার কথা শুনিয়া মনস্বীর বড় আনন্দ হইল। সে বলিল —'সখি, আমি যদি সেই ব্রাহ্মণযুবককে তোমার সম্মুখে আনিয়া দিতে পারি তবে আমায় কি দিবে?'

রাজকন্যা বলিলেন—'আমি তোমার দাসী হইয়া থাকিব।'

তখন মনস্বী তাহার নিজের রূপ ধারণ করিল।

এমন অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া রাজকন্যা প্রথমে বড়ই আশ্চর্য হইলেন। কিছুক্ষণ মনস্বীর দিকে তাকাইয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন —'তুমি কি করিয়া এতদিন মেয়ে সাজিয়াছিলে, আবার কি করিয়াই বা নিজের রূপ ধরিলে?'

তখন মনস্বী সেই উপবনে রাজকন্যাকে দেখিবার পর হইতে যাহা ঘটিয়াছিল, সব বলিল। শুনিয়া রাজকন্যা সন্তুষ্ট হইলেন। তারপর দুই-জনের গান্ধর্বমতে বিবাহ হইল। রাজকন্যা মনস্বীকে অন্তঃপুরেই রাখিয়া দিলেন।

তারপর হইতে দুইজনেই পরম সুখে দিন কাটাইতে লাগিল।

মনস্বী মেয়ের বেশ ধরিয়া রাজকন্যার কাছে থাকে। সকলেই জানে সে সেই বুড়া ব্রাহ্মণের পুত্রবধূ। কিন্তু একদিন রাজা সুবিচার মন্ত্রী-পুত্রের কথায় তাহার উপর বড় দুর্ব্যবহার করিলেন। মনস্বী দেখিল, তাহার আর সেখানে থাকা উচিত নয়। সে গোপনে অন্তঃপুর হইতে পলাইয়া ভূদেবের বাড়ী গেল ও তাহাকে সকল কথা জানাইলে সে শুনিয়া চমৎকৃত হইল। এদিকে রাজা সুবিচার যখন শুনিলেন, ব্রাহ্মণবধূকে পাওয়া যাইতেছে না, তখন তিনি মনে মনে প্রমাদ গণিলেন ; ভাবিলেন,—সর্বনাশ ! সেই বুড়া ব্রাহ্মণ আসিয়া তাহার পুত্রবধূকে চাহিলে, কি বলিব ? সে নিশ্চয়ই শাপ দিয়া আমার সর্বনাশ করিবে ! বধূটির উপর আমি যদি দুর্ব্যবহার না করিতাম, তাহা হইলে সে কখনই পলাইত না। এখন কি করি ?

ওদিকে আবার ভূদেব শশীকে তাহার বিশ বৎসর বয়সের পুত্র সাজাইয়া, নিজে সেই বুড়ার বেশ ধরিয়া রাজসভায় গিয়া উপস্থিত। তাহাকে দেখিয়াই রাজা ভীত হইলেন। তবুও তাহাকে বসিতে আসন দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'মহাশয়ের ফিরিতে এত দেরী হইল কেন ?'

ভূদেব বলিল—'মহারাজ ! অনেক খুঁজিয়া আমার ছেলেকে পাইয়াছি। সেইজন্য ফিরিতে দেরী হইল। যাহা হউক, এখন পুত্র-বধূকে লইয়া ঘরে যাইব।'

তখন রাজা ব্রহ্মশাপের ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে জোড়হাতে বুড়া ব্রাহ্মণের কাছে সকল কথা বলিলেন।

শুনিয়া বুড়া ব্রাহ্মণ রাগে কাঁপিতে লাগিল ; সে রাজাকে শাপ দেয় আর কি।

রাজা বিনীতভাবে বলিলেন—'মহাশয় ! আমাকে ক্ষমা করুন। আপনার ক্ষতিপূরণের জন্য যাহা বলিবেন, তাহাই করিব।'

ভূদেব বলিল—'যদি আপনার মেয়ের সঙ্গে আমার এই ছেলের বিবাহ দেন, তাহা হইলে ক্ষমা করিতে পারি।'

রাজা তাহাতেই সম্মত হইয়া বুড়ার ছেলের সঙ্গে তাঁহার মেয়ে

চন্দ্রপ্রভার বিবাহ দিলেন। বিবাহের পর ভূদেব ছেলে ও বউকে লইয়া বাড়ী গেল। কিন্তু সেখানে গিয়াই শশী ও মনস্বী রাজকন্যাকে লইয়া ঝগড়া করিতে লাগিল। দুইজনেই বলে—'এ স্ত্রী আমার, এ স্ত্রী আমার।'

গল্পের পর বেতাল জিজ্ঞাসা করিল—"মহারাজ! শাস্ত্র ও যুক্তি অনুসারে রাজকন্যা কাহার স্ত্রী বলুন।"

রাজা বলিলেন—"মনস্বীর। কেননা তাহার সঙ্গেই গান্ধর্বমতে রাজকন্যার বিবাহ হইয়াছিল। এখন রাজা না জানিয়া-শুনিয়া শশীর সঙ্গে রাজকন্যার বিবাহ দিলেও তাহা সিদ্ধ হয় না।"

ইহা শুনিয়া বেতাল ইত্যাদি—

পঞ্চদশ গল্প

চলিতে চলিতে বেতাল বলিল—"মহারাজ! হিমালয় পর্বতের গায়ে পুষ্পসার নামে একটি সুন্দর নগর ছিল। ঐ নগরে গন্ধর্বরাজ জীমূতকেতু রাজত্ব করিতেন। কল্পবৃক্ষের পূজা করিয়া তাহার বরে রাজা জীমূতকেতুর একটি পুত্র জন্মে। তিনি পুত্রটির নাম রাখেন জীমূতবাহন। জীমূতবাহন বড় শান্ত ও সুশীল ছিলেন। শিক্ষায় তাঁহার এমন মনোযোগ ছিল যে, অল্পকালের মধ্যেই তিনি সকল শাস্ত্রে পণ্ডিত ও একজন নিপুণ যোদ্ধা হইয়া উঠেন।

কিছুকাল পরে রাজা আবার কল্পবৃক্ষের পূজা করিয়া তাহার কাছে বর চাহিলেন—'আমার প্রজারা খুব ধনী হউক।' কল্পবৃক্ষ তাঁহার প্রার্থনা পূরণ করিলেন। প্রজারা দিন দিন ধনী হইয়া উঠিল। শেষে এমন হইল যে, ধনের অহঙ্কারে রাজাকেও তাহারা তুচ্ছ জ্ঞান করিতে লাগিল। রাজার কিন্তু কোনদিকে মনোযোগ নাই; তিনি রাতদিন ধর্মচিন্তায় বিভোর। সুযোগ বুঝিয়া রাজার জ্ঞাতিরা বিদ্রোহী হইল। তাহারা একদিন অনেক সৈন্যসামন্ত লইয়া রাজবাড়ী ঘিরিয়া ফেলিল।

এই ব্যাপার দেখিয়া যুবরাজ জীমূতবাহন পিতাকে বলিলেন—'মহারাজ! আপনি আজ্ঞা দিলে আমি এখনই যুদ্ধ করিয়া সকলকে পরাস্ত করি ও বিদ্রোহীদের শাস্তি দি।'

জীমূতকেতু পুত্রকে নিষেধ করিলেন; বলিলেন—'বাবা! জীবন কবে আছে কবে নাই। বিষয়-আশয়ও নিতান্ত তুচ্ছ। ইহার জন্য মারামারি কাটাকাটির দরকার নাই। চল, এসব ছাড়িয়া কোন নির্জন জায়গায় গিয়া ভগবানের আরাধনা করি।'

তারপর তিনি পুত্র জীমূতবাহনকে লইয়া মলয়-পর্বতে চলিয়া গেলেন এবং সেখানে কুটীর বাঁধিয়া ভগবানের আরাধনা করিতে লাগিলেন।

সেখানে এক বণিককুমারের সঙ্গে জীমূতবাহনের বন্ধুত্ব হইল। একদিন দুই বন্ধুতে বেড়াইতে বাহির হইয়াছেন। কিছুদূরে কাত্যায়নী দেবীর মন্দির ছিল। সেখান হইতে মধুর বীণার শব্দ শুনিতে পাইয়া দুই বন্ধুর বড় কৌতূহল হইল। তাঁহারা সেখানে গিয়া দেখিলেন, একটি পরমাসুন্দরী মেয়ে দেবীর সম্মুখে বসিয়া বীণা বাজাইয়া গান করিতেছে। দুইজনে বসিয়া তাহা শুনিতে লাগিলেন।

কিছুক্ষণ পরে গান শেষ করিয়া মেয়েটি জীমূতবাহনকে দেখিতে পাইল। রাজকুমারের সুন্দর চেহারা দেখিয়া সে তাহাকে মনে মনে বিবাহ করিল ও সখীকে দিয়া তাঁহার পরিচয় লইয়া বাড়ী চলিয়া গেল।

ঐ মেয়ে রাজা মলয়কেতুর কন্যা। সে বাড়ী গিয়া সখীকে দিয়া মাতার কাছে সমস্ত কথা জানাইল। মাতা রাজা মলয়কেতুর কাছে সমস্ত কথা জানাইলেন। রাজা মলয়কেতু তাঁহার পুত্র মিত্রাবসুকে বলিলেন—'তোমার ভগ্নীর বিবাহের বয়স হইয়াছে। এখন উহাকে উপযুক্ত পাত্রের হাতে দেওয়া দরকার। শুনিলাম, রাজা জীমূতকেতু তাঁহার পুত্র জীমূতবাহনকে লইয়া মলয়পর্বতে বাস করিতেছেন। আমার ইচ্ছা জীমূতবাহনের সঙ্গে তোমার ভগ্নীর বিবাহ দি। তুমি তাঁহার কাছে গিয়া আমার ইচ্ছা জানাও।'

পিতার আজ্ঞায় মিত্রাবসু জীমূতকেতুর কাছে গিয়া সমস্ত কথা জানাইল। রাজা জীমূতকেতু তৎক্ষণাৎ তাহাতে রাজী হইয়া জীমূতবাহনকে মিত্রাবসুর সঙ্গে মলয়কেতুর কাছে পাঠাইয়া দিলেন। সেখানে দুইজনের বিবাহ হইয়া গেল। তারপর বর-কন্যা মহাসুখে দিন কাটাইতে লাগিলেন।

একদিন জীমূতবাহন ও মিত্রাবসু মলয়পর্বতে বেড়াইতে বাহির হইলেন। পর্বতের উত্তরদিকে এক জায়গায় রাশীকৃত সাদা জিনিস দেখিতে পাইয়া জীমূতবাহন মিত্রাবসুকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'বন্ধু! ওখানে রাশীকৃত সাদা জিনিস দেখিতেছি। ওগুলি কি?'

মিত্রাবসু বলিল—'আগে সাপ ও গরুড়ে যুদ্ধ লাগিয়াই থাকিত। কিছুকাল পরে সাপেরা পরাস্ত হইয়া গরুড়ের সঙ্গে সন্ধি করিতে চাহিলে, গরুড় বলিল,'তোমরা যদি প্রত্যহ আমাকে একটি করিয়া সাপ খাইতে দাও, তাহা হইলে সন্ধি করিতে পারি।' সাপেরা তাহাতেই রাজী হইল। সেইদিন হইতে প্রত্যহ একটি করিয়া সাপ আসিয়া ঐখানে উপস্থিত থাকে; দ্বিপ্রহরে গরুড আসিয়া তাহাকে খাইয়া ফেলে। সেইজন্য প্রত্যহ সাপের হাড় জমিয়া অমন পর্বতপ্রমাণ হইয়া উঠিয়াছে।'

মিত্রাবসুর কথা শুনিয়া জীমূতবাহনের মনে দয়া হইল। তিনি ভাবিলেন,—'নিশ্চয়ই আজওগরুড়ের জন্য একটি সাপ আসিয়া অপেক্ষা করিতেছে। আমি নিজের প্রাণ দিয়া তাহার প্রাণ রক্ষা করিব।' এই ভাবিয়া তিনি কৌশলে মিত্রাবসুকে বাড়ী পাঠাইয়া দিলেন; তারপর সেই হাড়ের পাহাড়ের কাছে গিয়া দেখিলেন, সেখানে এক বৃদ্ধা নাগিনী উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতেছে আর নিজের কপালে আঘাত করিতেছে। জীমূতবাহন ধীরে ধীরে বৃদ্ধার কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'মা! তুমি এমন করিয়া কাঁদিতেছ কেন?'

বৃদ্ধা বলিল—'বাবা! আজ আমার একমাত্র ছেলে শঙ্খচূড়কে হারাইব। আজ তাহার পালা। কিছুক্ষণ পরেই গরুড় আসিয়া তাহাকে খাইয়া ফেলিবে। সেইজন্য কাঁদিতেছি।'

জীমূতবাহন বলিলেন—'মা ! তুমি আর কাঁদিও না। আমি আজ নিজের প্রাণ দিয়া তোমার ছেলের প্রাণ রক্ষা করিব।'

বৃদ্ধা বলিল—'বাবা ! তুমি কেন পরের জন্য প্রাণ দিতে যাইবে ? পরের ছেলের প্রাণ দিয়া নিজের ছেলেকে বাঁচাইলে ঘোর অধর্ম হইবে।'

দুইজনে এই রকম কথাবার্তা হইতেছে, এমন সময় শঙ্খচূড় আসিয়া উপস্থিত। সে জীমূতবাহনের পরিচয় পাইয়া ও সমস্ত কথা শুনিয়া বলিল—'মহারাজ ! আপনার মত ধার্মিক ও দয়ালু পৃথিবীতে খুব কমই আছেন। আপনি বাঁচিয়া থাকিলে অনেকের উপকার হইবে। কিন্তু আমার মত লোকের প্রাণের মূল্য কি ? আমার মৃত্যু হইলে কাহারও কোন ক্ষতি নাই। আপনি কখনও আমার জন্য প্রাণ দিবেন না।'

জীমূতবাহন বলিলেন—'শুন শঙ্খচূড় ! আমি ক্ষত্রিয়। আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, তোমার প্রাণ রক্ষা করিব। ক্ষত্রিয়েরা প্রাণের চেয়ে প্রতিজ্ঞাকে বড় করিয়া দেখে।' এই বলিয়া তিনি শঙ্খচূড়কে সেখান হইতে বিদায় দিয়া তাহার জায়গায় গরুড়ের অপেক্ষায় বসিয়া রহিলেন।

শঙ্খচূড় নিতান্ত বিষণ্ণমনে সেখান হইতে দেবী কাত্যায়নীর মন্দিরে গিয়া জীমূতবাহনের প্রাণরক্ষার জন্য প্রার্থনা করিতে লাগিল।

এদিকে নির্দিষ্ট সময় উপস্থিত হইল। আকাশ অন্ধকার করিয়া ভয়ঙ্কর শব্দ করিতে করিতে গরুড় উড়িয়া আসিল। জীমূতবাহন তেমনি বসিয়া আছেন। গরুড় জীমূতবাহনকে শঙ্খচূড় সাপ মনে করিয়া চঞ্চু দিয়া চাপিয়া ধরিল ; তারপর তাহাকে লইয়া আকাশে উঠিয়া ঘুরপাক দিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে আকাশ হইতে জীমূতবাহনের ডান হাতের রক্তমাখা কেয়ূর স্ত্রী মলয়বতীর সম্মুখে খসিয়া পড়িল। কেয়ূরে জীমূতবাহনের নাম লেখা ছিল। মলয়বতী কেয়ূরটি তুলিয়া লইয়া তাহার উপরে নামটি পড়িয়াই কাঁদিয়া উঠিল। রাজা, রাণী, রাজকুমারও সেই কেয়ূর দেখিয়া হাহাকার করিতে

লাগিলেন। জীমূতবাহনের খোঁজে চারিধারে লোকজন ছুটিল।

শঙ্খচূড় এতক্ষণ কাত্যায়নী দেবীর মন্দিরে প্রার্থনা করিতেছিল। রাজবাড়ী হইতে কান্নার শব্দ শুনিয়া সে বুঝিল, জীমূতবাহনের কোন অমঙ্গল হইয়াছে। সে তাড়াতাড়ি সেই হাড়ের পাহাড়ের কাছে আসিয়া চীৎকার করিয়া গরুড়কে ডাকিয়া বলিতে লাগিল—'ওহে পক্ষিরাজ! তুমি ভুল করিয়া রাজা জীমূতবাহনকে ধরিয়া লইয়া গিয়াছ। আজ আমাকে তোমার খাইবার পালা। উহাকে ছাড়িয়া দিয়া আমাকে লইয়া যাও, না হইলে তোমার অধর্ম হইবে।'

শঙ্খচূড়ের কথা শুনিয়া গরুড়ের বড় ভয় হইল। সে তৎক্ষণাৎ মৃতপ্রায় জীমূতবাহনকে জিজ্ঞাসা করিল—'ওহে মহাপুরুষ! তুমি কে? কিজন্য নিজের প্রাণ দিতে উদ্যত হইয়াছ?'

জীমূতবাহন নিজের পরিচয় দিয়া বলিলেন—'একদিন-না-একদিন আমাকে মরিতেই হইবে। যদি পরের উপকারে আজই নিজের প্রাণ দিতে পারি, তাহার চেয়ে বড় কাজ আর কি আছে? সেইজন্য আমি শঙ্খচূড়ের হইয়া প্রাণ দিতেছি।'

জীমূতবাহনের কথা শুনিয়া গরুড় তাহাকে অনেক সাধুবাদ দিয়া বলিল—'আমি তোমার উপর সন্তুষ্ট হইয়াছি। বর প্রার্থনা কর।'

জীমূতবাহন বলিলেন—'পক্ষিরাজ! যদি সন্তুষ্ট হইয়া থাক, তাহা হইলে এই বর দাও, আজ হইতে আর নাগবধ করিবে না। আর, এতদিন যাহাদের খাইয়াছ, তাহাদেরও বাঁচাইয়া দাও।'

গরুড় 'তথাস্তু' বলিয়া পাতাল হইতে অমৃত আনিয়া, সেই হাড়গুলির উপর ছিটাইয়া দিতেই নাগেরা তৎক্ষণাৎ বাঁচিয়া উঠিল। তারপর গরুড় জীমূতবাহনকে 'রাজকুমার! আমার বরে তুমি রাজ্য ফিরিয়া পাইবে।' বলিয়া চলিয়া গেল।

সকলে জীমূতবাহনের এই ব্যাপার শুনিয়া চমৎকৃত হইল। জীমূতকেতুর শত্রু জ্ঞাতিরা আসিয়া আবার তাঁহাকে রাজ্যে ফিরাইয়া লইয়া গেল ও সিংহাসন ছাড়িয়া দিল।"

জীমূতবাহনের গল্প শেষ করিয়া বেতাল জিজ্ঞাসা করিল—

"মহারাজ! শঙ্খচূড় ও জীমূতবাহনের মধ্যে কাহার ভদ্রতা বেশী?"

রাজা বলিলেন—"শঙ্খচূড়ের।"

—"জীমূতবাহন এমন ত্যাগ স্বীকার করিল, তবুও তাহার ভদ্রতা শঙ্খচূড়ের চেয়ে কম কেন বলিতেছেন?"

—"জীমূতবাহন ক্ষত্রিয়। ক্ষত্রিয়েরা প্রাণকে তুচ্ছ জ্ঞান করে। কিন্তু প্রথমতঃ শঙ্খচূড় কোনমতে তাঁহার জন্য জীমূতবাহনের প্রাণত্যাগে সম্মত হয় নাই; শেষে সম্মত হইল বটে, তবুও জীমূতবাহনের প্রাণরক্ষা করিবার জন্য কাত্যায়নীর কাছে প্রার্থনা করিতে লাগিল। তাহার পরও সে নিজের প্রাণ দিতে উদ্যত হইয়াছিল।"

ইহা শুনিয়া বেতাল ইত্যাদি—

ষোড়শ গল্প

মহারাজ বিক্রমাদিত্য আবার বেতালকে লইয়া চলিলেন। কিছুদূর যাইবার পর বেতাল বলিল—"মহারাজ! চন্দ্রশেখর নগরে রত্নদত্ত নামে এক বণিক ছিল। তাহার কন্যার নাম ছিল উন্মাদিনী। উন্মাদিনীর মত সুন্দরী মেয়ে সংসারে দেখা যায় না। সে বড় হইলে রত্নদত্ত রাজার কাছে গিয়া নিবেদন করিল—'মহারাজ! আমার এক সুন্দরী কন্যা আছে। আপনার যদি ইচ্ছা হয় তাহাকে বিবাহ করুন। না হইলে আমি অপর কোন পাত্রের সঙ্গে তাহার বিবাহ দিব।'

কিন্তু কেবল তাহার কথায় ত রাজি হওয়া যায় না; রাজা দুই-তিন জন বয়স্ক কর্মচারীকে মেয়েটির রূপ-গুণ পরীক্ষার জন্য পাঠাইলেন। তাঁহারা রত্নদত্তের বাড়ী গিয়া দেখিলেন, উন্মাদিনী সত্যই পরমাসুন্দরী। এমন সুন্দরী ত্রিভুবনের কোথাও নাই। তখন তাঁহারা পরামর্শ করিলেন 'রাজার কাছে গিয়া বলা যাক্ মেয়েটি নিতান্ত কুলক্ষণা ও কুরূপা। নতুবা এমন সুন্দরী মেয়ে রাণী হইলে রাজা রাজকার্য্যে জলাঞ্জলি দিয়া দিনরাত অন্তঃপুরেই থাকিবেন।'

তাঁহারা ফিরিয়া গিয়া রাজাকে জানাইলেন, রত্নদত্তের মেয়েটি কুরূপা ও কুলক্ষণা। রাজা তাঁহাদের কথায় বিশ্বাস করিয়া মেয়েটিকে বিবাহ করিতে রাজী হইলেন না। তখন রত্নদত্ত রাজার সেনাপতি বলভদ্রের সঙ্গে উন্মাদিনীর বিবাহ দিল।

কিছুদিন পরে রাজা একদিন নগরের মধ্যে বেড়াইতে বেড়াইতে সেনাপতির বাড়ীর কাছে গিয়া উপস্থিত হইলেন। উন্মাদিনী তখন বেশ-ভূষা পরিয়া বাড়ীর ছাদের উপর দাঁড়াইয়াছিল। রাজা তাহার রূপ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গেলেন। এমন সুন্দরী মেয়ে ত তিনি কখনও দেখেন নাই। তিনি অন্যমনস্ক হইয়া তৎক্ষণাৎ রাজবাড়ীতে ফিরিলেন।

তাঁহাকে অন্যমনস্ক ও হঠাৎ ফিরিতে দেখিয়া রাজার একজন প্রিয় সঙ্গী জিজ্ঞাসা করিল—'মহারাজ! কি জন্য আজ আপনি এমন অন্যমনস্ক?'

রাজা বলিলেন,—'দেখ, সেনাপতি বলভদ্রের বাড়ীতে আজ একটি সুন্দরী মেয়ে দেখিলাম। আমার ধারণা, তাহার মত সুন্দরী ত্রিভুবনে কোথায়ও নাই।'

সঙ্গী বলিল—'মহারাজ! উনি বণিক রত্নদত্তের কন্যা। আপনি উহাকে বিবাহ করিতে অস্বীকার করায় রত্নদত্ত বলভদ্রের সঙ্গে উহার বিবাহ দিয়াছে।'

রাজা বলিলেন—'আমি ঐ মেয়েটির রূপ-গুণ পরীক্ষা করিতে যাহাদের পাঠাইয়াছিলাম, বুঝিলাম, তাহারা আমাকে প্রতারণা করিয়াছে।' তারপর তিনি সেই কর্মচারীদের ডাকাইয়া বলিলেন,—'তোমরা আমাকে প্রতারণা করিয়াছ। রত্নদত্তের মেয়েকে আজ আমি নিজে দেখিয়াছি। সে অপরূপ সুন্দরী। তবে কেন মিথ্যা কথা বলিয়াছিলে?'

তাহারা বলিল—'মহারাজ! ঐ মেয়ের সঙ্গে বিবাহ হইলে আপনি রাজকার্য্যে মন না দিয়া কেবল অন্তঃপুরেই থাকিতেন। তাহাতে রাজ্যের ক্ষতি হইত। সেইজন্য মিথ্যা বলিয়াছিলাম। মহারাজ! আমাদের ক্ষমা করুন।'

রাজা বলিলেন—'তোমরা যাহা বলিলে তাহা ঠিক। আচ্ছা, তোমরা যাও।' কিন্তু তখন হইতে রাজা এমন মনঃকষ্টে দিন কাটাইতে লাগিলেন যে, দশম দিনে তাঁহার মৃত্যু হইল।

প্রভুভক্ত সেনাপতি বলভদ্র রাজার মৃত্যু-সংবাদ শুনিয়া বড়ই ব্যথিত হইলেন; ভাবিলেন—'এমন প্রভু আমি আর পাইব না। ইনিই যখন মারা গেলেন, আমার বাঁচিয়া থাকায় লাভ কি? ধরিতে গেলে আমার জন্যই রাজার মৃত্যু হইল।' এই ভাবিয়া বলভদ্র শ্মশানে গিয়া নিজের জন্য চিতা প্রস্তুত করাইলেন। তারপর সূর্য্যদেবের দিকে জোড়হাতে তাকাইয়া বলিলেন—'ভগবান সূর্য্যদেব! তোমার কাছে আমার এই প্রার্থনা যেন জন্মে জন্মে আমি এমন প্রভু পাই।' বলিয়া তিনি জ্বলন্ত চিতায় ঝাঁপ দিলেন।

তাঁহার স্ত্রী উন্মাদিনীও ভাবিল,—'আমারই বা আর বাঁচিয়া থাকার কি দরকার? বরং স্বামীর সহগমন করিলে পুণ্য সঞ্চয় হইবে।' এই ভাবিয়া সেও স্বামীর সহগমন করিল।"

গল্প শেষ করিয়া বেতাল জিজ্ঞাসা করিল—"মহারাজ! রাজা, সেনাপতি বলভদ্র ও উন্মাদিনীর মধ্যে কাহার মহত্ত্ব বেশী?"

বিক্রমাদিত্য বললেন—"রাজার।"

—"কেন?"

—"রাজা ইচ্ছা করিলেই উন্মাদিনীকে রাণী করিতে পারিতেন। কিন্তু অধর্ম ও অপযশের ভয়ে তাহা করিলেন না; অথচ উন্মাদিনীর দুঃখে মারা গেলেন। আর প্রভুর জন্য ভৃত্য প্রাণ দিবে এবং স্ত্রীও স্বামীর সহগমন করিবে ইহা ত স্বাভাবিক। অতএব রাজার মহত্ত্বই বেশী।"

ইহা শুনিয়া বেতাল ইত্যাদি—

সপ্তদশ গল্প

বিক্রমাদিত্য বেতালকে লইয়া আবার চলিতেছেন।

"মহারাজ, শুনুন।" বলিয়া বেতাল সপ্তদশ গল্প আরম্ভ করিল—"হেমকুট নগরে বিষ্ণুশর্মা নামে এক ধার্মিক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার ছেলের নাম ছিল গুণাকর। গুণাকর বড় হইয়া কেবল পাশা খেলিয়া বেড়াইত। ক্রমে সে পাশা খেলায় মাতিয়া পিতার সমস্ত সম্পত্তি নষ্ট করিয়া ফেলিল। তখন বিষ্ণুশর্মা তাহাকে বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিলেন।

ইহার ফলে গুণাকর নিতান্ত নিরুপায় হইয়া এখানে-ওখানে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল! এমনি করিয়া সে এক নগরের শেষে আসিয়া পৌঁছিল। সেখানে এক যোগী যোগ সাধনা করিতেছিলেন। গুণাকর যোগীকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া তাঁহার সম্মুখে বসিল। যোগী গুণাকরের দিকে তাকাইয়া বুঝিলেন, তাহার ক্ষুধা পাইয়াছে। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—'তুমি কিছু খাইবে কি?'

গুণাকর বলিল—'আপনার প্রসাদ পাইলে নিশ্চয়ই তাহা খাইব।'

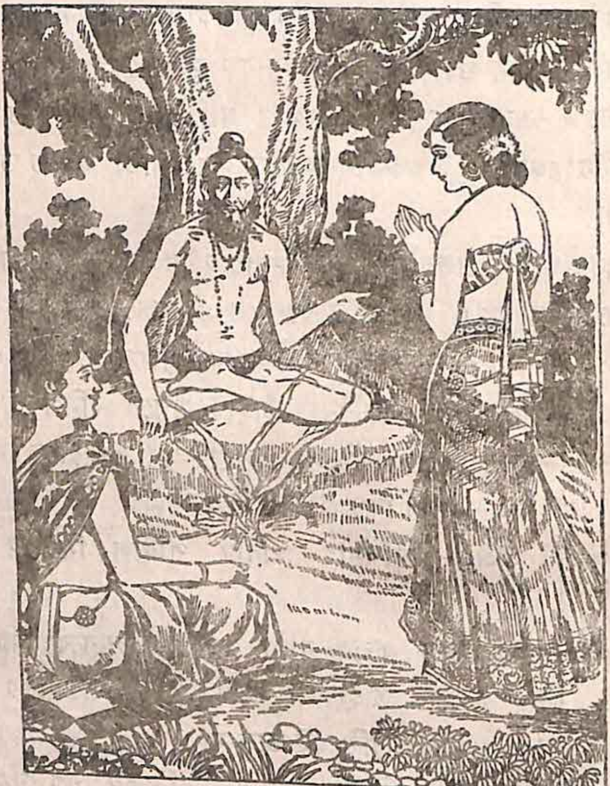
যোগী তখন একটা মড়ার মাথায় করিয়া তাহাকে অন্নব্যঞ্জন দিলেন। কিন্তু গুণাকর তাহা খাইল না; বলিল—'মহাশয়! এ অন্নব্যঞ্জন খাইতে আমার প্রবৃত্তি হইতেছে না।'

যোগী তখন চোখ বুজিয়া যোগাসনে বসিতেই এক যক্ষকন্যা সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। সে হাতজোড় করিয়া যোগীকে জিজ্ঞাসা করিল—'কি আজ্ঞা?'

যোগী বলিলেন—'এই ব্রাহ্মণটি আমার আশ্রমে আজ অতিথি। ইনি বড় ক্ষুধার্ত। ইঁহার সৎকার কর।'

যক্ষকন্যা 'যে আজ্ঞা' বলিয়া মায়াবলে নিমেষে সেখানে সুন্দর এক

গৃহ নির্মাণ করিল। তারপর গুণাকরকে তাহার মধ্যে লইয়া গিয়া সুগন্ধি চাউলের অন্নের সঙ্গে মাছ, মাংস, দধি, সন্দেশ প্রভৃতি খাওয়াইল। রাত্রেও গুণাকরের যত্নের ক্রুটি হইল না। গুণাকর মণিময় পালঙ্কে শুইলে যক্ষকন্যা তাহার চরণসেবা করিতে লাগিল। গুণাকর মহাসুখে ঘুমাইয়া পড়িল! কিন্তু সকালে ঘুম হইতে উঠিয়া দেখে সে সব কিছুই নাই।



যক্ষকন্যা হাতজোড় করিয়া জিজ্ঞাসা করিল...

সে তখন যোগীর কাছে সমস্ত কথা জানাইল। যোগী বলিলেন—'যোগবলে ঐ সব আসিয়াছিল। যে যোগসাধনে সিদ্ধিলাভ করিয়াছে, যক্ষকন্যা চিরকাল তাহার আজ্ঞা শুনে।'

তখন গুণাকরেরও ইচ্ছা হইল সে যোগ শিখিবে। যোগী তাহার

আগ্রহ দেখিয়া তাহাকে মন্ত্র দিয়া বলিলেন—'এই মন্ত্রটি তুমি অর্দ্ধরাত্রে গলা জলে দাঁড়াইয়া চল্লিশ দিন জপ করিবে।'

গুণাকর গুরুর উপদেশে তাহাই করিল। তারপর গুরুকে জিজ্ঞাসা করিল—'এখন কি আজ্ঞা হয়?'

যোগী বলিলেন—'ঐ মন্ত্রটি আরও চল্লিশ দিন আগুনে প্রবেশ করিয়া জপ করিলে তুমি সিদ্ধিলাভ করিবে।'

এদিকে মাতাপিতাকে অনেকদিন না দেখিয়া গুণাকরের মন বড় অস্থির হইয়াছিল। সে বলিল—'প্রভু! অনেকদিন বাড়ী ছাড়িয়া বাহির হইয়াছি। মাতাপিতাকে দেখিবার জন্য মন বড় ব্যাকুল হইয়াছে। দিন কয়েকের জন্য তাঁহাদের দেখিয়া আসি।'

গুরু তৎক্ষণাৎ তাহাকে বাড়ী যাইতে আদেশ দিলেন। গুণাকর বাড়ী চলিয়া আসিল। তাহার মাতাপিতা বহুদিন পরে তাহাকে পাইয়া অনেক কাঁদিলেন; বলিলেন—'এতদিন তোমাকে না দেখিয়া বড় দুঃখে ছিলাম।'

গুণাকর এতদিন কোথায় ছিল মাতাপিতাকে জানাইয়া বলিল—'আপনাদের জন্য মন বড় চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল, তাই দেখিয়া গেলাম। এবার জন্মের মত বিদায় দিন; আমি যোগসাধন করিতে যাইব।'

মাতাপিতা তাহাকে কিছুতেই ছাড়িয়া দিতে রাজী হইলেন না। কিন্তু গুণাকর তাঁহাদের অনেক বুঝাইয়া আবার গুরুর কাছে ফিরিয়া আসিল। তারপর তাঁহার উপদেশ মত আগুনে প্রবেশ করিয়া মন্ত্রসাধন করিতে লাগিল; তবুও সিদ্ধিলাভ করিতে পারিল না।"

গল্প শেষ করিয়া বেতাল জিজ্ঞাসা করিল—"মহারাজ! কি জন্য গুণাকর সিদ্ধ হইতে পারিল না?"

রাজা বলিলেন—"এক মনে মন্ত্রসাধন না করিলে সিদ্ধি লাভ করা যায় না। গুণাকরের মনে একাগ্রতা ছিল না, তাই সে বিফল হইল।"

ইহা শুনিয়া বেতাল ইত্যাদি—

অষ্টাদশ গল্প

আবার দুইজনে চলিতেছেন।

বেতাল বলিল—"মহারাজ! কুবলয়পুরের বণিক ধনপতি খুব ধনী ছিলেন। তিনি গৌরীদত্তের সঙ্গে তাঁহার কন্যা ধনবতীর বিবাহ দেন। কিছুকাল পরে ধনবতীর এক কন্যা জন্মে। গৌরীদত্ত তাহার নাম রাখেন, মোহিনী। কিছুকাল পরে গৌরীদত্ত মারা গেলে তাহার জ্ঞাতিবর্গ ধনবতীর সমস্ত সম্পত্তি কাড়িয়া লইল। ফলে ধনবতী আর সেখানে থাকিতে পারিল না; এক অন্ধকার রাত্রে কন্যাকে লইয়া পিত্রালয়ে রওনা হইল।

অন্ধকার রাত্রি। দুইজনে চলিতেছে। কিছুদূর গিয়া তাহারা পথ ভুলিয়া এক শ্মশানে আসিয়া পড়িল। সেখানে কয়েকদিন আগে এক চোরকে শূলে দেওয়া হইয়াছিল; কিন্তু তখন পর্য্যন্ত তাহার মৃত্যু হয় নাই। চলিতে চলিতে হঠাৎ ধনবতীর ডান হাতখানি চোরের গায়ে লাগিতেই চোর যন্ত্রণায় বলিয়া উঠিল—'তুমি কে? আমার এই কষ্টের উপর আবার কষ্ট দাও কেন?'

ধনবতী বলিল—'আমি না জানিয়া দোষ করিয়াছি। আমাকে ক্ষমা কর।' তারপর সে চোরের কাছে নিজের পরিচয় দিয়া জিজ্ঞাসা করিল—'তুমি কে? কি জন্য শ্মশানে থাকিয়া কষ্ট পাইতেছ?'

চোর বলিল—'আমি জাতিতে বণিক। চুরির দায়ে আমাকে তিন দিন হইল শূলে দেওয়া হইয়াছে; কিন্তু আজও আমার মৃত্যু হয় নাই। কেননা, শৈশবে গণকেরা বলিয়াছিলেন, বিবাহ না হইলে আমার মৃত্যু হইবে না। যদি তুমি আমার সঙ্গে তোমার মেয়েটির বিবাহ দাও, তাহা হইলেই আমার এই অসহ্য যন্ত্রণার শেষ হয়। আমি এক জায়গায় অনেক টাকাকড়ি লুকাইয়া রাখিয়াছি। তুমি আমার কথায় রাজী হইলে সে সব তোমায় দিয়া যাইব।'

ধনবতী টাকা-পয়সার লোভে চোরের কথায় মনে মনে রাজী হইল ; বলিল—'তুমি যাহা বলিলে, তাহাতে আপত্তি নাই। কিন্তু দৌহিত্রের মুখ দেখিতে আমার বড় সাধ। তোমার সঙ্গে মেয়ের বিবাহ দিলে আমার সে সাধ মিটিবে না।'

চোর বলিল—'তুমি এখন আমার সঙ্গে মেয়েটির বিবাহ দিয়া আমার এই যন্ত্রণার শেষ কর। আমি অনুমতি দিতেছি, তোমার মেয়ে বড় হইলে পরে আর কাহারও সঙ্গে উহার বিবাহ দিও। তাহা হইলেই তোমার সাধ মিটিবে।'

ধনবতী তখন চোরের সঙ্গে মোহিনীর বিবাহ দিল। চোর বলিল —'ঐ গ্রামের পশ্চিম সীমায় আমার বাড়ী। বাড়ীর পূর্বদিকে এক কূয়ার কাছে একটি বটগাছ দেখিতে পাইবে। সেই গাছের গোড়ায় টাকাকড়ি পোঁতা আছে।' বলিয়াই চোর প্রাণত্যাগ করিল।

ধনবতীও চোরের কথামত বটগাছের গোড়া খুঁড়িয়া অনেক মোহর ও মণিমুক্তা প্রভৃতি পাইল। তারপর সেখান হইতে পিত্রালয়ে গিয়া পিতার কাছে সমস্ত কথা জানাইল।

সেই দিন হইতে ধনবতী পিত্রালয়েই থাকে। চোরের সম্পত্তিতে তাহাদের কোন দুঃখ নাই। ক্রমে মোহিনী বেশ বড় হইল। ধনপতি অনেক খুঁজিয়া পয়সা-কড়ির লোভ দেখাইয়া একটি পাত্রের সঙ্গে তাহার বিবাহ দিলেন ; কিন্তু দিন কয়েক থাকিয়াই পাত্রটি টাকা-কড়ি লইয়া পলাইয়া গেল।

কিছুদিন পরে মোহিনীর একটি পুত্র হইল। ষষ্ঠীর দিন রাত্রে মোহিনী স্বপ্ন দেখিল—এক পুরুষ ষাঁড়ে চড়িয়া তাহার সম্মুখে আসিলেন। তাঁহার দুই হাত, পাঁচ মাথা, প্রতি মাথায় তিনটি করিয়া চোখ ও অর্দ্ধচন্দ্র, পিঠে লম্বা জটা ঝুলিতেছে ; তাঁহার ডান হাতে ত্রিশূল, গলায় সাপের মালা, পরিধানে বাঘছাল, গায়ের রং ধবধবে সাদা ; আর, বুকে সাদা সাপের পৈতা, গায়ে ভস্ম। তিনি মোহিনীকে বলিলেন—'বৎসে! তোমার ছেলে হইয়াছে, এজন্য আমি বড় আনন্দিত। ছেলেটি ক্ষণজন্মা। সে বড় হইয়া সমস্ত পৃথিবীর

অধিপতি হইবে। আমার আজ্ঞায় ঐ ছেলেটিকে একহাজার স্বুবর্ণ মুদ্রার সঙ্গে একটি পেটিকায় পুরিয়া অর্দ্ধরাত্রে রাজবাড়ীর দরজায় রাখিয়া আসিবে। রাজা তাহাকে নিজের ছেলের মত পালন করিবেন।' বলিয়াই পুরুষটি মিলাইয়া গেলেন। মোহিনীরও ঘুম ভাঙিয়া গেল।

সে তাহার মায়ের কাছে স্বপ্নের কথা বলিলে, ধনবতী বড় আনন্দিত হইল এবং পরদিন যথাসময়ে এক হাজার স্বুবর্ণ মুদ্রার সঙ্গে ছেলেটিকে পেটিকায় পুরিয়া অর্দ্ধরাত্রে রাজবাড়ীর দরজায় রাখিয়া আসিল। ঠিক সেই সময়ে রাজাও স্বপ্ন দেখিতেছেন, সেই পুরুষটি তাঁহার সম্মুখে আসিয়া বলিতেছেন, 'মহারাজ! উঠ! তোমার দরজায় একটি স্বুলক্ষণ ছেলে পেটিকার মধ্যে করিয়া আসিয়াছে। তাহাকে প্রতিপালন কর। পরে সে-ই তোমার সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হইবে।'

রাজার ঘুম ভাঙিয়া গেল। তিনি তৎক্ষণাৎ রাণীকে জাগাইয়া স্বপ্নের কথা বলিলেন। তারপর দুইজনে রাজবাড়ীর দরজায় গিয়া দেখিলেন, সত্যই একটি পেটিকার মধ্যে একটি স্বুন্দর ছেলে রহিয়াছে। রাণী সেই ছেলেটিকে বুকে তুলিয়া লইলেন। তাহার নাম হইল হরদত্ত।

তারপর দিন যায়। হরদত্ত বড় হইতে লাগিলেন। যেমনি লেখা-পড়ায় তাঁহার মনোযোগ, তেমনি তিনি যুদ্ধ-বিদ্যায়ও নিপুণ। শেষে রাজার মৃত্যু হইলে হরদত্ত রাজা হইয়া সমস্ত পৃথিবী জয় করিয়া লইলেন।

কিছুকাল পরে মহারাজ হরদত্ত তীর্থযাত্রায় বাহির হইয়া গয়াধামে উপস্থিত হইলেন। সেখানে ফল্গু নদীর তীরে শ্রাদ্ধ করিয়া তিনি পিতার নামে পিণ্ড দিতেই নদীর মধ্য হইতে তিনটি লোকের ডান হাত বাহির হইল—একখানি চোরের, দ্বিতীয়খানি রাজা হরদত্তের পিতার, তৃতীয়খানি রাজার।"

এই বলিয়া বেতাল জিজ্ঞাসা করিল—"মহারাজ! বলুন উহাদের

মধ্যে কে হরদত্তের পিণ্ড পাইবার যথার্থ অধিকারী ?"

রাজা বলিলেন—"চোর।"

"অপর দুইজনে অধিকারী নহেন কেন ?"

—"রাজা হরদত্তকে পালন করিয়াছিলেন মাত্র ; আর মোহিনীর দ্বিতীয় স্বামী কেবল টাকা-পয়সার লোভেই তাহাকে বিবাহ করিয়াছিল। নতুবা সে পলাইবে কেন ?"

ইহা শুনিয়া বেতাল ইত্যাদি—

ঊনবিংশ গল্প

রাজার কাঁধে চড়িয়া চলিতে চলিতে বেতাল বলিল—"মহারাজ ! চিত্রকূট নগরে রূপদত্ত নামে এক রাজা ছিলেন। একদিন তিনি একা মৃগয়ায় বাহির হইলেন। সারাদিন ঘোড়ায় চড়িয়া বনে বনে মৃগের সন্ধান করিতে করিতে শ্রান্ত হইয়া, তিনি এক ঋষির আশ্রমে আসিয়া পড়িলেন। সেখানে একটি সুন্দর পুষ্করিণী ছিল। রাজা একটি গাছতলায় ঘোড়াটি বাঁধিয়া ছায়ায় বসিয়া বিশ্রাম করিতেছেন।

কিছুক্ষণ পরে একটি ঋষির কন্যা আসিয়া স্নান করিবার জন্য জলে নামিল। রাজা দেখিলেন, মেয়েটি অপরূপ সুন্দরী। তাঁহার ইচ্ছা হইল মেয়েটিকে বিবাহ করেন। কিন্তু মেয়েটি প্রথমে তাঁহার সঙ্গে কোনও কথা বলিল না। রাজা অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। মেয়েটি স্নান সারিয়া আশ্রমের দিকে যাইতেই রাজা তাহার সম্মুখে আসিয়া বলিলেন—'ঋষিকন্যে ! আমি রৌদ্রে ও পথশ্রমে ক্লান্ত হইয়া তোমার আশ্রমে বিশ্রামের জন্য আসিলাম, অথচ তুমি আমার সঙ্গে একটি কথাও বলিলে না। এই কি তোমার উচিত ?'

রাজার কথা শুনিয়া ঋষিকন্যা তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইল। সেই সময়ে ঋষিও ফল, ফুল, কুশ প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া ফিরিয়া আসিলেন। রাজা তাঁহাকে দেখিয়াই নিজের পরিচয় দিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন।

ঋষিও রাজাকে এই বলিয়া আশীর্বাদ করিলেন—'তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হউক।'

ঋষির আশীর্বাদ শুনিয়া রাজার মনে দুষ্ট অভিসন্ধি দেখা দিল। তিনি ঋষিকে বলিলেন—'মহাশয়। চিরকাল শুনিয়া আসিতেছি ঋষির কথা মিথ্যা হয় না; কিন্তু আমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবার ত কোন লক্ষণ দেখিতেছি না।'

ঋষি বলিলেন—'নিশ্চয়ই হইবে।'

রাজা বলিলেন—'আমার ইচ্ছা এই মেয়েটিকে বিবাহ করি।'

রাজার কথা শুনিয়া ঋষি মনে মনে রাগ করিলেন; কিন্তু কি আর করেন, এদিকে রাজাকে আশীর্বাদ করিয়া ফেলিয়াছেন। তখন রাজার সঙ্গে সেই মেয়েটির বিবাহ দিলেন। রাজাও আর দেরী করিলেন না। নূতন রাণীকে লইয়া রাজধানীতে রওনা হইলেন। পথে এক জায়গায় আসিলে রাত্রি হইল। রাজা-রাণী কিছু ফল-মূল খাইয়া একটি গাছের তলায় শুইলেন।

রাত্রি অর্দ্ধেক হইয়াছে, এমন সময়ে এক রাক্ষস আসিয়া রাজাকে জাগাইয়া বলিল—'আমার বড় ক্ষুধা পাইয়াছে; তোমার স্ত্রীকে খাইব।'

রাজা বলিলেন—'তুমি আমার স্ত্রীকে খাইও না। তাহার বদলে যাহা চাও তাহাই দিব।'

তখন রাক্ষস বলিল—'তুমি যদি খুশী হইয়া একটি বার বৎসরের ব্রাহ্মণের ছেলের মাথা কাটিয়া আমার হাতে দিতে পার, তাহা হইলে তোমার স্ত্রীকে খাইব না।'

রাজা তাহাতেই সম্মত হইয়া বলিলেন—'আজ হইতে সপ্তম দিনে তুমি আমার রাজধানীতে গেলে যাহা চাহিবে তাহাই দিব।'

এইরূপে রাজাকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিয়া রাক্ষস চলিয়া গেল। রাজাও সকাল হইলে নূতন রাণীকে লইয়া রাজধানীতে ফিরিয়া আসিলেন; কিন্তু তাঁহার মন দুশ্চিন্তায় ভার হইয়া রহিল। মন্ত্রী রাজার দুশ্চিন্তার কারণ জানিয়া বলিলেন—'মহারাজ! আপনি উহার জন্য চিন্তিত

হইবেন না ; আমি সব ঠিক করিয়া দিব।

রাজা মন্ত্রীর কথায় নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন।

মন্ত্রী একটি মানুষের সমান সোনার প্রতিমা গড়াইয়া তাহাকে নানা রকম গহনা পরাইয়া নগরের চৌরাস্তার উপর রাখিয়া প্রচার করিলেন, —'যে ব্রাহ্মণ বলিদানের জন্য নিজের ছেলেকে দান করিবেন, তাঁহার ঐ মূর্ত্তিটি দেওয়া হইবে।'

এক গরীব ব্রাহ্মণের একটি বার বৎসর বয়সের ছেলে ছিল। তিনি এই কথা শুনিয়া তাঁহার ব্রাহ্মণীকে বলিলেন—'দেখ, গরীব হইয়া সংসারে বাঁচিয়া থাকা বিড়ম্বনা। আজ পর্যন্ত টাকা-পয়সার মুখ দেখিলাম না। কেবল দুঃখই ভোগ করিতেছি। এখন কিন্তু টাকা উপায়ের একটা সহজ পথ দেখা যাইতেছে। যদি ছেলেটাকে দিয়া প্রতিমাখানি লইয়া আসি, তাহা হইলে সুখে কাল কাটাইতে পারিব।'

ব্রাহ্মণীও তাহাতে রাজী হইলেন। ব্রাহ্মণ ছেলেটিকে দিয়া প্রতিমা লইয়া আসিল। ওদিকে ঠিক সপ্তম দিন সকালে রাক্ষস আসিয়া উপস্থিত।

তৎক্ষণাৎ ব্রাহ্মণের ছেলেটিকে বলিদানের জন্য আনা হইল। রাজা তাহার মাথা কাটিবার জন্য খড়্গ তুলিতেই ছেলেটি মাথা নীচু করিয়া একটু হাসিল। রাজা কিন্তু কোন দিকেই তাকাইলেন না, তিনি স্বচ্ছন্দে ছেলেটির মাথা কাটিয়া রাক্ষসের হাতে দিলেন।"

গল্প শেষ করিয়া বেতাল জিজ্ঞাসা করিল—"মহারাজ! মরিবার সময়ে লোকে কাঁদে; কিন্তু ছেলেটি না কাঁদিয়া হাসিল কেন?"

রাজা বলিলেন—"ছেলেবেলায় মাতাপিতা লালনপালন করেন। তারপরে কোন বিপদ ঘটিলে রাজা রক্ষা করিয়া থাকেন ; কিন্তু কপাল-দোষে আমার পক্ষে তাহার উল্টা হইল। মাতাপিতা অর্থলোভে আমায় বিক্রয় করিলেন ; আর রক্ষক রাজাও আমাকে কাটিয়া ফেলিতে উদ্যত।—এই ভাবিয়া ছেলেটি হাসিয়াছিল।"

ইহা শুনিয়া বেতাল ইত্যাদি—

বিংশ গল্প

বেতাল বলিল—"মহারাজ! আর একটি গল্প বলিতেছি। বিশালপুর নগরে অর্থদত্ত নামে একজন ধনশালী বণিক ছিলেন। তাঁহার কন্যার নাম ছিল অনঙ্গমঞ্জরী। শৈশব হইতে এক বালকের সঙ্গে অনঙ্গমঞ্জরীর খুব ভাব ছিল। বড় হইলে দুইজনেরই ইচ্ছা পরস্পরকে বিবাহ করে ; কিন্তু অর্থদত্ত সে কথা জানিতেন না। লজ্জায় অনঙ্গমঞ্জরী বা ঐ বালকও কাহাকেও তাহাদের মনের ইচ্ছা জানায় নাই। সেইজন্য অর্থদত্ত কমলপুরবাসী মদনদাস নামে এক বণিকের সঙ্গে অনঙ্গমঞ্জরীর বিবাহ দিলেন। সে শ্বশুর-বাড়ী চলিয়া গেল। বালকটির সঙ্গে তাহার আর দেখা হইল না।

কিছুদিন গেল। অনঙ্গমঞ্জরী শ্বশুর-বাড়ীতে থাকে ; সকলেরই সেবা করে। সকলেই তাহার উপর সন্তুষ্ট। একদিন তাহার স্বামী বাণিজ্য করিতে বিদেশে চলিয়া গেল! এমন সময় একদিন অনঙ্গমঞ্জরী কাজ-কর্ম সারিয়া জানালায় দাঁড়াইয়া আছে ; দেখিল, সেই ছেলেটি পথ দিয়া আসিতেছে। সেই ছেলেটিও তাহাকে দেখিতে পাইল। তখন দুইজনের মনেই আগের সব কথা জাগিয়া উঠিল। দুইজনের মনেই খুব দুঃখ হইল ; কিন্তু কেহ কাহারও সঙ্গে কোন কথা বলিল না। ছেলেটি চলিয়া গেলে অনঙ্গমঞ্জরী ধূলায় শুইয়া কাঁদিতে লাগিল।

শ্বশুর-বাড়ীতে অনঙ্গমঞ্জরীর এক সখী ছিল। দুইজনে খুব ভাব ; কিন্তু অনঙ্গমঞ্জরী তাহাকেও এতদিন ছেলেটির কথা বলে নাই। আজ অনঙ্গমঞ্জরীকে কাঁদিতে দেখিয়া সখী তাহাকে আদর করিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিল। অনঙ্গমঞ্জরী প্রথমে তাহাকে সে কথা জানাইল না। পরে তাহার পীড়াপীড়িতে সকল কথা খুলিয়া বলিল। সখী তখন তাহাকে অনেক বুঝাইল, অনেক সান্ত্বনা দিল, কিন্তু অনঙ্গমঞ্জরী কিছুতেই শান্ত হইল না। সে কাঁদিতে কাঁদিতে হঠাৎ অজ্ঞান হইয়া পড়িল!

অনঙ্গমঞ্জরীর সখীর সঙ্গেও ছেলেটির কিছু পরিচয় ছিল। সে বিদেশী হইলেও তাহাদের গ্রামে এক আত্মীয়ের বাড়ীতে মাঝে মাঝে আসিত। সখী বুঝিল, অনঙ্গমঞ্জরী আর বাঁচিবে না। এই সময় অনঙ্গমঞ্জরীর সঙ্গে ছেলেটির একবার দেখা করাইলে ভাল হয়। সে তৎক্ষণাৎ ছেলেটির কাছে ছুটিল।

ওদিকে অনঙ্গমঞ্জরীকে দেখা পর্য্যন্ত ছেলেটিও দুঃখে কাঁদিতেছিল। সখীর মুখে অনঙ্গমঞ্জরীর কথা শুনিবামাত্র সে ছুটিয়া আসিল; কিন্তু হায়! তাহার আসিবার আগেই অনঙ্গমঞ্জরীর প্রাণ বাহির হইয়া গিয়াছিল। ইহা দেখিয়া ছেলেটিও সেইখানে পড়িয়া মারা গেল।

বাড়ীর সকলে এই ব্যাপার শুনিয়া দুইজনকে শ্মশানে লইয়া গিয়া, এক চিতায় শোয়াইয়া আগুন দিল! অদৃষ্টক্রমে অনঙ্গমঞ্জরীর স্বামীও বাড়ী ফিরিতেছিল। সে অনঙ্গমঞ্জরীর মৃত্যুর খবর শুনিয়া শ্মশানে গেল এবং সেই জ্বলন্ত চিতায় ঝাঁপাইয়া পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিল।"

এই পর্যন্ত বলিয়া বেতাল জিজ্ঞাসা করিল—"মহারাজ! ঐ তিন জনের মধ্যে কাহার ভালবাসা বেশী?"

রাজা বলিলেন—"মদনদাসের।"

—"কেন?"

—"অনঙ্গমঞ্জরী, ও ছেলেটি পরস্পরকে ভালবাসিত। সুতরাং একজনের মৃত্যুতে আর একজন প্রাণত্যাগ করিবে ইহাতে আশ্চর্য্যের কিছু নাই। কিন্তু অনঙ্গমঞ্জরী অন্য একজনকে ভালবাসিত জানিয়াও মদনদাস তাহার মৃত্যুতে এমন বেদনা পাইল যে, প্রাণত্যাগ করিল। এই জন্যই তাহার ভালবাসা বেশী।"

ইহা শুনিয়া বেতাল ইত্যাদি—

একবিংশ গল্প

একবিংশ গল্প আরম্ভ করিয়া বেতাল বলিল—"মহারাজ! জয়স্থল নগরে বিষ্ণুস্বামী নামে এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তাঁহার চারিটি ছেলে ছিল। ছেলেরা কিন্তু কেহই সচ্চরিত্র ছিল না। প্রথমটি পাশা খেলিয়া বেড়াইত। দ্বিতীয়টি ছিল লম্পট; তৃতীয়টি নির্লজ্জ ও চতুর্থটি নাস্তিক। একদিন ব্রাহ্মণ তাহাদের চারিজনকে খুব তিরস্কার করিলেন; বলিলেন—'পাশা খেলিলে লক্ষ্মীছাড়া হয়; লম্পট হইলে দুঃখের সীমা থাকে না; যে নির্লজ্জ সে যে-কোন মন্দ কাজ করিতে পারে; আর নাস্তিক লোকের মত অধার্মিক কে? তাহার সঙ্গে কথা বলিলেও অধর্ম হয়।'

ব্রাহ্মণের তিরস্কারে ছেলেদের মনে নিজেদের উপর বড় ঘৃণা জন্মিল। তাহারা চারজনে পরামর্শ করিল।—'ছেলেবেলায় লেখাপড়ায় মনোযোগ দিই নাই; সেইজন্য আমাদের এমন দুর্দশা। যাহা হউক, চল, এখন বিদেশে গিয়া প্রাণপণ যত্নে বিদ্যাশিক্ষা করিয়া আসি।' এই বলিয়া চারিজনে বিদেশে চলিয়া গেল এবং নানা দেশে ঘুরিয়া বিদ্যা-শিক্ষা করিল।

তারপর একদিন চারিজনেই একসঙ্গে দেশে ফিরিতেছে। চলিতে চলিতে এক জায়গায় আসিয়া তাহারা দেখিল, এক মুচী একটা মরা বাঘের মাংস ও চামড়া লইয়া চলিয়া গেল; কেবল বাঘের হাড়গুলি চারিধারে ছড়াইয়া পড়িয়া রহিল।

চারি ভাইয়ের মধ্যে একজন হাড় জোড়া লাগাইবার বিদ্যা শিখিয়াছিল। সে বাঘের হাড়গুলি এক জায়গায় করিয়া জোড়া লাগাইল। দ্বিতীয় জন মাংস লাগাইতে শিখিয়াছিল। সে বাঘটার গায়ে মাংস লাগাইল। তৃতীয় জন চামড়া লাগাইতে জানিত; সে সেই বিদ্যার বলে বাঘের গায়ে চামড়া লাগাইল। আর চতুর্থ জন তৎক্ষণাৎ সঞ্জীবনী বিদ্যা-বলে বাঘটাকে বাঁচাইল। প্রাণ পাইয়া বাঘ

নিমেষে চারিজনকেই মারিয়া ফেলিল।"

গল্পের শেষে বেতাল জিজ্ঞাসা করিল—"মহারাজ! চারি ভাইয়ের মধ্যে সবচেয়ে বোকা কে?"

রাজা বলিলেন—"যে বাঘটাকে বাঁচাইয়াছিল।"

ইহা শুনিয়া বেতাল ইত্যাদি—

দ্বাবিংশ গল্প

বেতাল বলিল—"মহারাজ! বিশ্বপুর নগরে এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন; তাঁহার নাম নারায়ণ। নারায়ণ একদিন মনে মনে ভাবিলেন,—'আমি এখন বুড়া হইয়াছি। ভাল করিয়া চলা-ফিরা বা কাজ-কর্ম করিতে পারি না; জীবনও কবে আছে, কবে নাই। কিন্তু আমার মরিতে একটুও ইচ্ছা হয় না। ইচ্ছা হয়, যুবক হইয়া আবার সংসারের সুখ ভোগ করি; কিন্তু এই জীর্ণ দেহে ত তাহা সম্ভব নয়। যদি মন্ত্রবলে কোন যুবকের শরীরে প্রবেশ করিতে পারি, তাহা হইলেই আমার ইচ্ছা পূর্ণ হয়। আমি একজনের দেহ হইতে আর একজনের দেহে প্রবেশ করিবার মন্ত্র জানি। সেই মন্ত্রের বলেই আমি এক যুবকের দেহে প্রবেশ করিব। এই ভাবিয়া স্ত্রী, পুত্র, পৌত্র, দৌহিত্র প্রভৃতিকে একত্র ডাকিয়া বলিলেন—'দেখ, আমি বুড়া হইয়াছি। আর সংসারধর্ম করিতে ইচ্ছা হয় না। এ বয়সে কেবল পরকালের চিন্তা করা দরকার। আমি ঠিক করিয়াছি, বনে গিয়া তপস্যা করিব। তোমরা আমায় বিদায় দাও।'

সকলে ব্রাহ্মণের এই মিথ্যা কথায় বিশ্বাস করিল। ব্রাহ্মণকে ছাড়িতে সকলেরই মনে কষ্ট হইল। ব্রাহ্মণ চলিয়া গেলেন। সেখান হইতে গিয়া তিনি এক জায়গায় যুবকের দেহে প্রবেশ করিয়া, নিজের ইচ্ছাপূরণ করিতে লাগিলেন।"

এই পর্য্যন্ত বলিয়া বেতাল জিজ্ঞাসা করিল—"মহারাজ! ব্রাহ্মণ

নিজের দেহ ছাড়িবার সময় কাঁদিয়াছিলেন ; আবার যখন ঐ যুবকের দেহে প্রবেশ করেন. তখন খুব হাসিয়াছিলেন। ইহার কারণ কি ?"

রাজা বলিলেন —"নিজের দেহ ছাড়িবার সময় ব্রাহ্মণ এই ভাবিয়া কাঁদিলেন,—'আমার বহু যত্নের বহু দিনের আগের পরিবারের সঙ্গে আর কোন সম্বন্ধ রহিল না ; আর হাসিলেন এই ভাবিয়া যে, এখন হইতে তিনি তাঁহার ইচ্ছা স্বচ্ছন্দে পূরণ করিতে পারিবেন।"

ইহা শুনিয়া বেতাল ইত্যাদি—

ত্রয়োবিংশ গল্প

রাজা আবার বেতালকে গাছ হইতে নামাইয়া কাঁধে লইয়া চলিতেছেন। তখন বেতাল বলিল—"মহারাজ! ত্রয়োবিংশ গল্প শুনুন। ধর্মপুরে গোবিন্দ নামে এক ব্রাহ্মণের দুই ছেলে ছিল। তাহাদের একজন ছিল ভোজনবিলাসী, অর্থাৎ খাদ্যে যদি কোন দোষ থাকিত, সাধারণে তাহা ধরিতে না পারিলেও সে তাহা জানিতে পারিয়া ঐ খাদ্য কখনই খাইত না। আর একজন ছিল শয্যাবিলাসী, অর্থাৎ বিছানায় সামান্য দোষ থাকিলেও সে তাহাতে শুইত না। একদিন তাহাদের এই অসাধারণ ক্ষমতার কথা সেখানকার রাজার কানে গেল। তিনি তাহাদের এই ক্ষমতার বিষয় পরীক্ষা করিবার জন্য দুইজনকে রাজধানীতে আনাইলেন। দুই ভাই রাজার সম্মুখে উপস্থিত হইলে, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—'তোমরা কে কোন্ বিষয়ে বিলাসী ?'

তাহারা নিজের নিজের পরিচয় দিলে রাজা প্রথমে ভোজনবিলাসীকে পরীক্ষা করিবার জন্য পাচককে ডাকিয়া তাহার জন্য খুব ভাল করিয়া নানারকম খাদ্য তৈয়ারী করিতে বলিলেন। রাজার আজ্ঞায় পাচক তাহার সমস্ত কৌশল দিয়া নানারকম খাদ্য তৈয়ারী করিল ; সে খাদ্যের যেমন গন্ধ, তেমনি স্বাদ। খাদ্য তৈয়ারী হইলে রাজার কাছে খবর গেল। তিনি ভোজনবিলাসীকে খাইবার আজ্ঞা

দিলেন। ভোজনবিলাসীও খাইতে গেল ; কিন্তু আসনে বসিয়াই সে উঠিয়া পড়িল। তারপর রাজার কাছে গেলে তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'কেমন হে খুব তৃপ্তির সঙ্গে খাইয়াছ ত ?'

সে বলিল—'না মহারাজ ! আমি খাইতে পারি নাই।'

—'কেন ?'

—'ভাতে মরার গন্ধ ছিল। বোধ হয় শ্মশানের ধারের ক্ষেতের চাল রান্না করা হইয়াছিল।'

তাহার কথা শুনিয়া রাজা তাহাকে পাগল মনে করিয়া হাসিলেন ; কিন্তু কথাটা গোপন রাখিয়া ভাণ্ডারীকে ডাকিয়া চা'লের বিষয় খোঁজ লইতে বলিলেন। ভাণ্ডারী খোঁজ লইয়া জানাইল, ভোজনবিলাসীর জন্য শ্মশানের ধারের ক্ষেতের চা'ল রান্না করা হইয়াছিল। ভাণ্ডারীর কথা শুনিয়া রাজা চমৎকৃত হইয়া ভোজনবিলাসীকে বলিলেন—'তুমি যথার্থ ভোজনবিলাসী।'

তারপর শয্যাবিলাসীর পরীক্ষা আরম্ভ হইল। রাজা তাহার জন্য একখানি সুন্দর শয়নঘরে দুধের মত ধবধবে সাদা ও পালকের মত নরম অতি সুন্দর বিছানা পাতিতে আদেশ দিলেন। বিছানা পাতা হইলে শয্যাবিলাসী রাজার আদেশে তাহার উপর শুইল ; কিন্তু বেশীক্ষণ শুইয়া থাকিতে পারিল না, উঠিয়া আসিয়া রাজাকে বলিল—'মহারাজ, বিছানার সপ্তম তলে একগাছি ছোট চুল আছে। সেইজন্য আমার শুইতে বড় কষ্ট হইতেছিল, শুইতে পারিলাম না।'

রাজা তৎক্ষণাৎ শুইবার ঘরে গিয়া বিছানা তুলিয়া দেখিতে পাইলেন, সত্যিই তাই। তিনি তখন তাহার যথেষ্ট প্রশংসা করিলেন এবং দুইজনকে প্রচুর পুরস্কার দিয়া বিদায় করিলেন।"

গল্প শেষ করিয়া বেতাল জিজ্ঞাসা করিল—"মহারাজ ! ঐ দুই-জনের মধ্যে কাহার বোধশক্তি বেশী ?"

রাজা বলিলেন—"আমার মতে শয্যাবিলাসীর।"

ইহা শুনিয়া বেতাল ইত্যাদি—

চতুর্বিংশ গল্প

বেতাল বলিল—"মহারাজ! আর একটি গল্প শুনুন। কলিঙ্গদেশে যজ্ঞশর্মা নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। বহুদিনের আরাধনায় দেবতার বরে তাঁহার একটি ছেলে হয়। ছেলেটি অল্পদিনের মধ্যেই সকল শাস্ত্রে পণ্ডিত হইয়া মাতা-পিতার সেবা করিতে থাকে। দুর্ভাগ্যবশতঃ ছেলেটি বেশীদিন বাঁচে না; মাত্র আঠার বৎসর বয়সে তাহার মৃত্যু হয়। ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী ছেলের জন্য অনেক কাঁদিয়া তাহাকে সৎকার করিবার জন্য গ্রামের শেষে শ্মশানে লইয়া যান।

ঐ শ্মশানে এক যোগী বহুকাল ধরিয়া তপস্যা করিতেছেন। তিনি ব্রাহ্মণ-ছেলেটির শব দেখিয়া মনে মনে ভাবিলেন—'আমি বুড়া হইয়াছি। শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে; এইজন্য কোন কাজকর্ম করিতে পারি না। যদি এই দেহ ছাড়িয়া ঐ ছেলেটির শরীরে প্রবেশ করি, তাহা হইলে অনেককাল যোগাভ্যাস করিতে পারিব।' এই ভাবিয়া তিনি নিজের দেহ ছাড়িয়া মরা ছেলেটির শরীরে প্রবেশ করিলেন।

ব্রাহ্মণের ছেলেটি তৎক্ষণাৎ বাঁচিয়া উঠিল। ব্রাহ্মণ ছেলেটিকে বাঁচিতে দেখিয়া প্রথমে খুব আনন্দিত হইয়া হাসিলেন, কিন্তু তারপরই মলিনমুখে কাঁদিতে লাগিলেন।"

ইহা বলিয়া বেতাল জিজ্ঞাসা করিল—"মহারাজ! ব্রাহ্মণ ছেলেটিকে বাঁচিতে দেখিয়া প্রথমে হাসিলেন ও পরে কাঁদিলেন কেন?"

রাজা বলিলেন—"প্রথমে ছেলেটিকে বাঁচিতে দেখিয়া ব্রাহ্মণের বড় আনন্দ হইয়াছিল। সেইজন্য তিনি হাসিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি পরের দেহে প্রবেশ করিবার বিদ্যা জানিতেন। তাহার বলে দেখিলেন, ছেলেটি বাঁচে নাই; তাহার শরীরে যোগী প্রবেশ করিয়াছেন। সেইজন্য পরে কাঁদিলেন।"

ইহা শুনিয়া বেতাল ইত্যাদি—

পঞ্চবিংশ গল্প

বেতাল বলিল—"মহারাজ! এবার পঞ্চবিংশ গল্প আরম্ভ করিতেছি।

দাক্ষিণাত্যে ধর্মপুর নগরে মহাবল নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার খুব প্রতাপ ছিল; কিন্তু একদিন অন্য এক শক্তিশালী রাজা অনেক সৈন্য-সামন্ত লইয়া আসিয়া রাজা মহাবলের রাজধানী ঘিরিয়া ফেলিলেন। দুই রাজার ঘোর যুদ্ধ হইল। ক্রমে রাজা মহাবলের পরাজয় ঘটিতে লাগিল। তিনি জয়ের আর কোন আশা না দেখিয়া তাঁহার রাণী ও কন্যাকে লইয়া বনে চলিয়া গেলেন। চলিতে চলিতে তিনজনেই বড় ক্লান্ত ও ক্ষুধার্ত। তখন রাজা, রাণী ও রাজকন্যাকে এক গাছের তলায় বসাইয়া বনে ফলমূল সংগ্রহের জন্য চলিয়া গেলেন।

এদিকে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। রাজা তবুও ফিরেন না। রাণী ও রাজকন্যা রাজার কথা ভাবিয়া বড় ভীত হইয়া পড়িলেন। তাঁহাদের মনে নানা কথা উঠিতে লাগিল।

ঐদিন কুণ্ডিনের রাজা চন্দ্রসেন বড় রাজকুমারকে লইয়া ঐ বনে মৃগয়ায় গিয়াছিলেন। তাঁহারা এমন গহন বনে মানুষের পায়ের চিহ্ন দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। অনেকক্ষণ লক্ষ্য করিয়া রাজা বলিলেন—'চিহ্ন দেখিয়া মনে হয় দুইটি স্ত্রীলোক অল্পক্ষণ আগেই এখান দিয়া হাঁটিয়া গিয়াছে। চল, খুঁজিয়া দেখি।'

খুঁজিতে খুঁজিতে দুইজনে কিছুদূর গিয়া দেখিলেন—একটি গাছের তলায় দুইটি স্ত্রালোক মুখোমুখি হইয়া চুপ করিয় বসিয়া আছেন। তাঁহাদের রূপে চারিধারের বন আলোকিত; কিন্তু তাঁহাদের মুখ বড় মলিন। তাঁহাদিগকে দেখিয়া রাজা ও রাজকুমারের মনে দয়া হইল। তাঁহারা রাণী ও রাজকুমারীকে অভয় দিয়া রাজধানীতে লইয়া গেলেন। সেখানে কিছুকাল থাকিবার পর, রাজা রাজকুমারীকে এবং রাজকুমার রাণীকে বিবাহ করিলেন।"

গল্প শেষ করিয়া বেতাল জিজ্ঞাসা করিল—"মহারাজ! ঐ দুই-জনের ছেলে হইলে, তাহাদের কি সম্পর্ক হইবে বলুন।"



দেখিলেন, দুইটি স্ত্রীলোক মুখোমুখি হইয়া বসিয়া আছে

রাজা বিক্রমাদিত্য বেতালের প্রশ্ন শুনিয়া ঈষৎ হাসিয়া চুপ করিয়া রহিলেন।

উপসংহার

রাজাকে হাসিতে দেখিয়া বেতাল ভাবিল, রাজা তাহার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিলেন না বলিয়া হাসিলেন। তখন সে বলিল—"মহারাজ! আমি আপনার সাহস ও অধ্যবসায় দেখিয়া বড় সন্তুষ্ট। এখন আপনাকে কিছু উপদেশ দিব। মন দিয়া শুনুন।

যে সন্ন্যাসী আপনাকে শব আনিতে পাঠাইয়াছেন, তাহার নাম শান্তশীল। সে জাতিতে কুমার। আর এই শব রাজা চন্দ্রভানুর। সন্ন্যাসী যোগবলে চন্দ্রভানুকে মারিয়া ফেলিয়াছে। এখন আপনাকে মারিতে পারিলেই তাঁর মন্ত্রসিদ্ধি হয়। এজন্য আপনাকে সাবধান করিয়া দিতেছি। সে পূজাশেষে আপনাকে বলিবে—'মহারাজ! দেবীকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করুন।' আপনি সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিবার কালে খড়্গ দিয়া সে আপনার মাথা কাটিয়া ফেলিবে। অতএব আপনি সাষ্টাঙ্গে প্রণাম না করিয়া বলিবেন 'আমি রাজা। কোনও কালে কাহাকেও সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করি নাই; কি করিয়া প্রণাম করিতে হয় জানি না, দেখাইয়া দিন।' যোগী যেমন আপনাকে তাহা দেখাইয়া দিতে যাইবে, আপনি তৎক্ষণাৎ খড়্গ দিয়া তাহার মাথা কাটিয়া ফেলিবেন। তারপর তাহার ও চন্দ্রভানুর দুইটি শব মন্দিরের কাছে উনানের ফুটন্ত তৈলে ফেলিয়া দিবেন। তাহা হইলে ঐ সন্ন্যাসী যে যোগ সাধনা করিয়াছিল, আপনি সেই যোগসিদ্ধ হইয়া সারা পৃথিবীর সম্রাট হইবেন।" এই বলিয়া বেতাল চন্দ্রভানুর শরীর হইতে বাহির হইয়া গেল।

রাজা সেই শব লইয়া শ্মশানে সন্ন্যাসীর কাছে উপস্থিত হইলে, সন্ন্যাসী বলিলেন—"মহারাজ! আপনার উপর আমি বড়ই সন্তুষ্ট হইয়াছি।" তারপর রাজা চন্দ্রভানুর মৃতদেহকে বাঁচাইয়া দেবীর সম্মুখে বলি দিয়া পূজা করিয়া রাজা বিক্রমাদিত্যকে বলিলেন,

"মহারাজ! দেবীকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করুন।"

রাজা বিক্রমাদিত্য বলিলেন—"আমি রাজা। কোনদিন কাহাকেও সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করি নাই। কি করিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিতে হয় জানি না, দেখাইয়া দিন।"

সন্ন্যাসী সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া রাজাকে দেখাইতে গেলে, রাজা তৎক্ষণাৎ দেবীর সম্মুখে খড়্গ দিয়া সন্ন্যাসীর মাথা কাটিয়া ফেলিলেন।

এই ব্যাপার দেখিয়া দেবতারা খুব আনন্দিত হইয়া স্বর্গ হইতে রাজার মাথায় পুষ্পবৃষ্টি করিলেন। দেবলোক হইতে ইন্দ্র আসিয়া রাজাকে বলিলেন—"মহারাজ! আমি তোমার সাহসে সন্তুষ্ট হইয়াছি; বর প্রার্থনা কর।"

রাজা বলিলেন—"প্রভো। আপনার দয়ায় আমার কিছুরই অভাব নাই। তবে এই বর চাই—যতদিন চন্দ্র, সূর্য, পৃথিবী থাকিবে, ততদিন যেন আমার এই বৃত্তান্ত সংসারে প্রসিদ্ধ থাকে।

দেবরাজ "তথাস্তু" বলিয়া অদৃশ্য হইলেন।

রাজা তখন মন্ত্র পড়িয়া সেই ফুটন্ত তৈলে চন্দ্রভানু ও সন্ন্যাসীর শব ফেলিয়া দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাল-বেতাল নামে দুই বিকটাকার বীরপুরুষ তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া জোড়হাতে জিজ্ঞাসা করিল—"কি আজ্ঞা মহারাজ?"

রাজা বলিলেন—"এখন তোমাদের দরকার নাই; কিন্তু যখনই তোমাদের ডাকিব, তখনই আসিবে।"

তাল-বেতাল "যে আজ্ঞা মহারাজ" বলিয়া চলিয়া গেল।

রাজা বিক্রমাদিত্যও সন্তুষ্ট মনে রাজধানীতে ফিরিয়া গেলেন এবং পৃথিবীতে অপরাজেয় সম্রাট হইয়া সুখে রাজ্য করিতে লাগিলেন।
